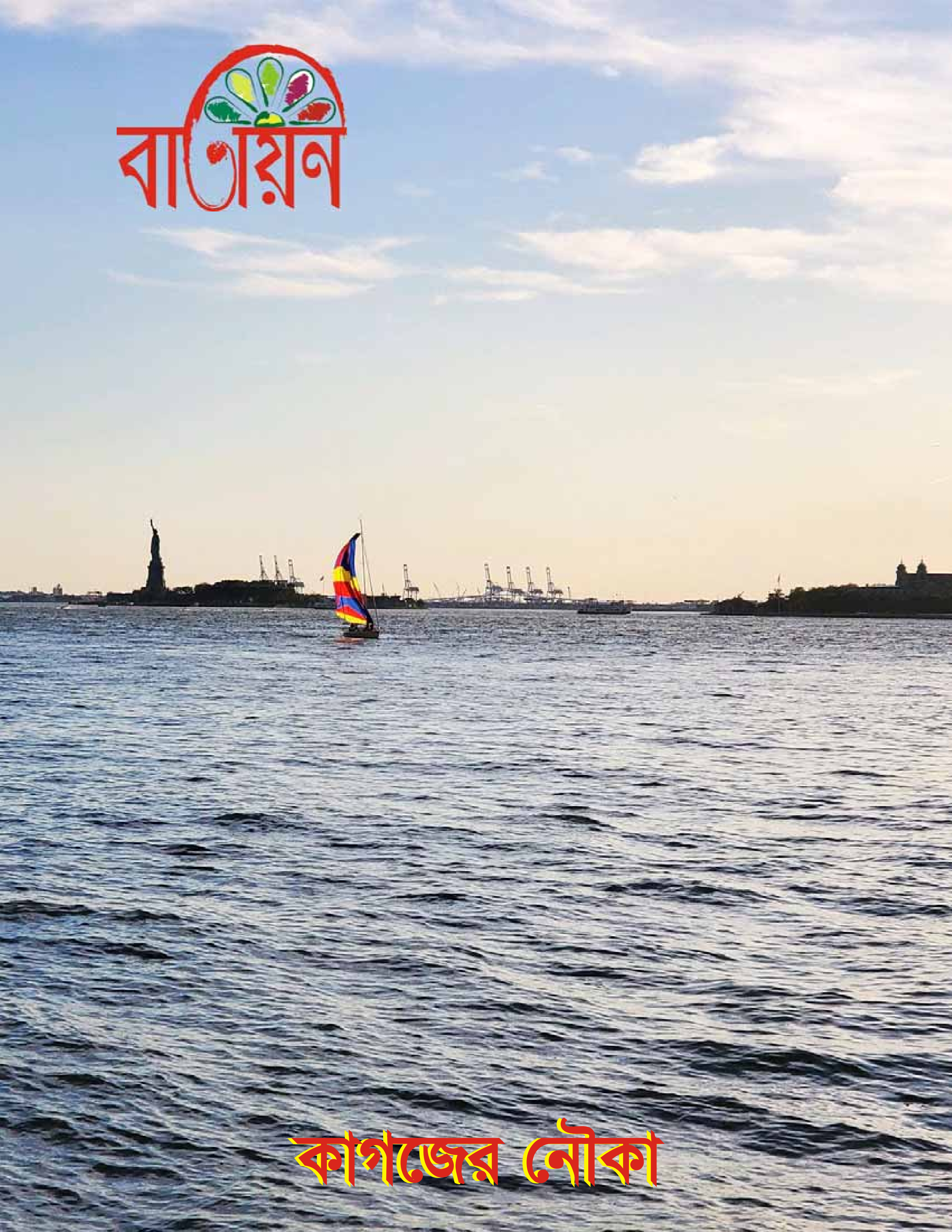

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

Partha
2018

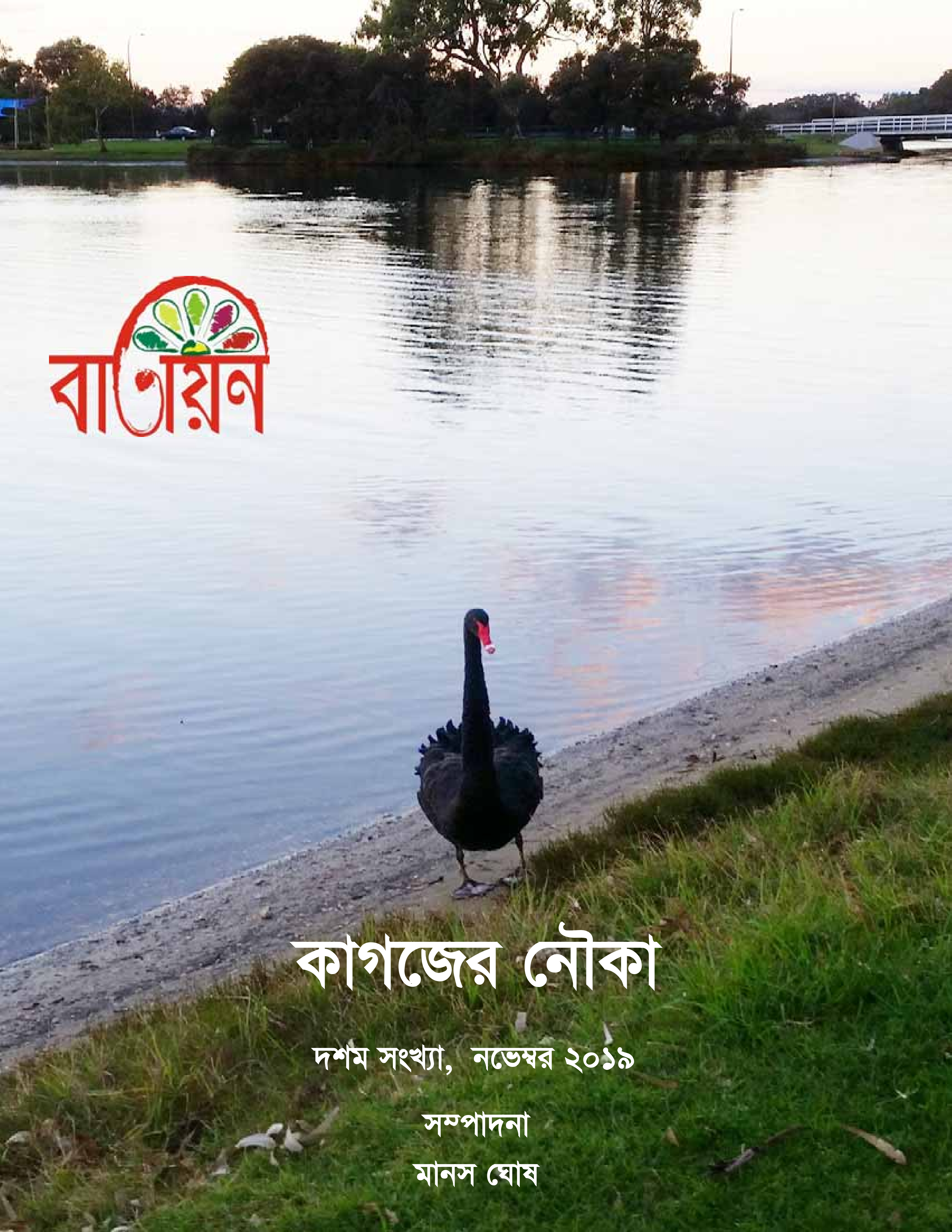

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

দশম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 9 : October 2019

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Front Cover : The photo was taken at Battery Park, New York City, USA. The ocean is The Atlantic Ocean.

Saumen Chattopadhyay

Saumen Chattopadhyay — Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Partha Pratim Ghosh **Banaras : Inside Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Benjamin Ghosh **Inside Back Cover & Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে। পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য।

Krishnakoli Bose Banerjea **Back Cover : St. Kilda – Sun set**

Krishnakoli Bose Banerjea – মেলবর্ন বাসিন্দা... মনে প্রাণে Calcacian. পেশায় Cloud Solution Architect. My analytical left brain is always being challenged by my creative right brain with music, painting, poetry, photography.... yet to find the winner..

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী

সকলকে জানাই শুভ বড়দিনের আগাম শুভেচ্ছা ! উৎসবের প্রস্তুতিতে সারা পৃথিবী জুড়ে সাজসাজো রব । তার মাঝেই মনে প্রশ্ন জাগে, যে ক্ষমাসুন্দর মহান পুরুষের জন্মদিন উপলক্ষে এত আয়োজন, এত সমারোহ . . . আমরা সত্যিই কি মনে রেখেছি তাঁকে? তাঁর উপদেশ, তাঁর শিক্ষা? তাহলে চারিদিকে কেন এত অনাচার, হিংসা, খুন, ধর্ষণ !

সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াতেও ভয় করে, মনে হয় কী দেখব ! দূষণে দম বন্ধ হয়ে আসে, একের পর এক অন্যায় আর নির্যাতনের ঘৃণ্য দৃশ্যপট, অসুস্থ বোধ করতে থাকি। হয়তো প্রতিবাদে মুখরও হই। তবু একসময় দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। আবার ফিরে আসি চেনা জানলাটির পাশে। আপনারাও আসুন আমার সঙ্গে, পুরোনো আসবাবপত্রের পাশ কাটিয়ে, বসার ঘর, লাইব্রেরি পেরিয়ে সেই প্রিয় জানলাটির কাছে, যাকে আমরা "বাতায়ন" বলে ডাকি । যে জানলা খুললেই যেন অন্য একটা দেশ। যা কিছু নান্দনিক যা কিছু সুন্দর সেই ছবি কবিতায় গল্পে যেন সেজে উঠেছে এক বিরাট উদ্যান ! এটুকুই তো আমাদের আশ্রয়, এই সারস্বত চর্চার ছায়াসঞ্চয়টুকুই তো আমাদের ঋদ্ধ করবে, শক্তি যোগাবে, – আবার দরজা খুলে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ! তাই আসুন, লিখতে থাকুন, পড়তে থাকুন, পাঠ প্রতিক্রিয়া পাঠান . . . সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই আমাদের এই কাগজের নৌকাখানি !

পুনশ্চঃ

কাগজের নৌকার পাঠক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে, তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ! পাঠক মতামতও যা আসছে, সেটা লেখকদের পক্ষে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক । প্রতিবারের মতো এইবারের কাগজের নৌকাতেও থাকছে নতুন চমক ।

উল্টে দেখুন, সঙ্গে থাকুন !

ইতি

মানস ঘোষ

সম্পাদক /কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	5
সঞ্জয় চক্রবর্তী	ক্লিপে আটকানো মেঘ	6
মানস ঘোষ	জীবন যেমন	7

গল্প

তপনজ্যোতি মিত্র	সুধাসাগর তীরে	23
ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত	শিলং-এ বাস্তব শেষের কবিতা	30

ধারাবাহিক গল্প

পারিজাত ব্যানার্জী	"এক-কম"	22

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	8
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	16

স্মৃতিচারণ

প্রশান্ত চ্যাটার্জী	উলুখাগড়ার দিনলিপি – অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে	25

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	চোর ও চুরি	20

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	বেনারসের ডায়রি	42

সিডনি থেকে

পারিজাত ব্যানার্জী	বিতর্ক আড্ডা	44

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ২০

পূর্বাচলের আবাসনে থাকে পালি
ঠিক বিপরীতে পশ্চিমে থাকে কবি
মাঝখান দিয়ে বয়ে চলে জাহ্নবী –
সাক্ষাৎ কবে কোথায় তার পাঁচালি
তুচ্ছ এবং অনাবশ্যক অতি ।
'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'
ছন্দে ও সুরে ভালোবাসা ওঠে ফুটে
জাহ্নবীজলে ঢেউ তোলে দ্রুতগতি ।
রবিঠাকুরের দু'গালে দু'দিক থেকে
চুমু খেতে গিয়ে দেখে মাঝে কেউ নেই
দু'জনের ঠোঁট দুজনের ঠোঁটে ঠেকে
সম্বিতে ফিরে দেখে গন্তব্যেই
পৌঁছে গিয়েছে রুদ্ধবাণীর দেশে –
বোধ ও বোধন যেখানে অসীমে মেশে

সনেট ২১

সীমানা পেরিয়ে পালির বাসস্থান
সেখানে শুধুই আকাশের যাতায়াত
আমি মাটি থেকে বাড়িয়েছিলাম হাত
খুব স্বাভাবিক – ইচ্ছেটা খানখান
দুরত্ব খুব বেশি নয় ভেবে ভুল
লাফ দিতে গেছি পাহাড়ের চূড়ো থেকে
জ্ঞান ফিরে দেখি কাস্পিয়ানের লেকে
ভাসছি – জানিনা বাঁচলাম বিলকুল
কি করে – এবং সেই থেকে বারবার
পর্বতরোহী আমি – বাসনাটা সেই
সীমানা পেরিয়ে যাবার অনধিকার
চর্চা – মানুষ চিরকাল পেরোতেই
চেয়েছে সীমানা – আমিও রবার্ট ব্রুস
হয়ে একদিন সীমানা পেরিয়ে – হুস্

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্‌সাল্‌টেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

ক্লিপে আটকানো মেঘ

সে দিন কিন্তু গরম ছিল,
স্পষ্ট মনে আছে ।
একলা ছাদে সিগারেট, হাফ
বেকার দিনের কাছে ।
হঠাৎ কেমন মেঘ করলো
সোঁদা হাওয়ার ঝাপড়,
উড়লো শুখনো পাতা
আর ক্লিপের জামা কাপড় ।
তখন প্রথম আড়চোখে
দুই চোখ দেখেছে তাকে,
ছাদে মেলা কাপড় তোলা
মেঘের মত যাকে ।
থমকেছে সেও এদিক পানে
ঠোঁটের হাসি টিপে,
হাওয়ায় ওড়া কালো দু চার
মেঘ আটকালো ক্লিপে ।
তার অবশ্যি সদ্য কলেজ,
আমারও কলেজ শেষে
মোষ তাড়াচ্ছি দেদার খানিক
ঘরের খেয়ে এসে ।

তবে, সেদিন থেকেই আলাপ টালাপ
দুই ছাদের দুই কোণে,
জোড়া শালিক কার্নিশে আর
জুড়তে চাওয়া মনে ।
জুড়তে জুড়তে হুঁশ ফেরেনা
বছর কখন ঘোরে,
অনিচ্ছেতে সম্বন্ধ হয়
বাড়ীর চাপের জোরে ।
শেষে যা হয়, চিরাচরিত,
উলু, সিন্দুর, বিয়ে ...
সিনেমা না কি যে আটকাবে
এক বেকার ছেলে গিয়ে ?
তাই মেঘের সাথে একলা ছাদের
অনেক দিনের আড়ি,
দুরের কোনো শহরকোণে
তার নতুন ঘর বাড়ী ।
তবু বেমক্কা মন, তথৈবচ,
ভেবেই যে কুল পায় না,
কখন মেঘ আসে আর হঠাৎ পালায়,
ক্লিপে আটকানো যায় না ।।

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনি নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

মানস ঘোষ

জীবন যেমন

অনেক জীবন অনেক চলা, এগিয়ে পথে আবার ফেরা,
সমান্তরাল বিপ্রতীপে, ছাপায় দুকুল কোথাও চরা ।

আসা যাওয়ার পথের ধারে ওঠানামার নাগরদোলা,
ঢেউয়ের মাথায় নেচে বেড়ায় নোঙ্গরবিহীন শোলার ভেলা !

নোঙ্গরবিহীন স্বপ্নমায়ায় ভেসে বেড়ায় উল্টো-সোজা . . .
অজানা কোন দমকা হাওয়ায় উড়ছে দেখো জয়ধ্বজা !

কিসের জেতা, কিসের হারা ? কিসের অহং ? বিজয়কেতন ?
ঢেউয়ের তালে চলতে থাকা অনেকটা ঠিক জীবন যেমন . . .

ট্রিগার

কানের পাশে ঠেকিয়ে, চাপলাম ট্রিগার . . .

একবার . . . দুবার . . . তিনবার

পিস্তলে গুলি নেই জেনেও, বারবার

ধীরে ধীরে প্রশমিত হয় খুনে রাগ, শুধু থেকে যায়

কানের পাশে অগভীর ক্ষত

খসে পড়া পলেস্তারার মতো ।

টহল

সূত্রগুলো যোগ হয়না গরহাজিরা রোগে

যত্রতত্র শব্দগুলো অপুষ্টিতে ভোগে ।

বাঁধের ওপর থাকতো যদি তোমার নীরব টহল

অন্ত্যমিলের শ্বেতপাথরে সাজত যে তাজমহল !

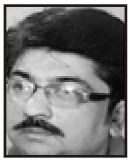

মানস ঘোষ – মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ‘‘ট্রেনচালক’’ । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা ‘বাতায়ন’ পাশে, আমাদের মাঝে ।

নবকুমার বসু

পর্ব ১০

হটাবাহার

(১৬)

বাড়ির গেট খুলে বেরুতে গিয়ে খানিকটা তফাতে উলটোদিকে ফুটপাথের দোকানটায় চোখ পড়ল সুদীপার। সাধারণত পড়ার কথা না। কিন্তু কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি-ই যেন একসঙ্গে ওঁর কাজ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর ঠিক তখনই মনে হল, আবার যেন সেই লোকটাকে এক ঝলক দেখতে পেলেন। সন্ধে হয়ে এসেছে। আলো আঁধারি ভাব ওদিকটায়। জায়গাটা হরিপদ দত্ত লেন-এর মুখে। প্রিন্স্ আনোয়ার শাহ্ রোড থেকে ঢোকা বেরুনর মুখে ওই জায়গাটায় সবসময়ই গাড়িঘোড়া কিংবা লোকজনের ভিড় হয়ে থাকে। গলিটা বাদ দিয়ে দোকানগুলোও ওখানে একেবারে গায়ে গায়ে। পাশাপাশি ষ্টেশনারি-মুদিখানা-ওষুধের দোকান-মনিহারি-বইখাতা, এমনকী মোটর পার্টসেরও দোকান। নানা ধরণের লোকজন, ক্রেতা থাকারই কথা। অথচ তার মধ্যেই একটা লোককে মুখচেনা মনে হওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই তাকে আগে কোথাও দেখেছেন, এবং কেবলই মনে হচ্ছে — একবার না, এই লোকটিকে তিনি একাধিকবার দেখেছেন এখানে-সেখানে।

অর্থাৎ লোকটি যে কোনও কারণেই হোক, তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে, এবং সম্ভবত তা কারুর নির্দেশে। হয়তো নিজেকে তার আড়াল করেই রাখার কথা। কিন্তু লোকটি ততখানি চৌখশ না, যতখানি হলে সুদীপার নজর এড়াতে পারতো।

কিন্তু কথা হচ্ছে, সুদীপার মতো একজন মহিলার ওপর এই নজরদারির প্রয়োজন হচ্ছে কেন! কারই বা দরকার পড়ছে! সুরূপা বলল, খুবই সোজা দিদিভাই . . . অপুরা যেহেতু এখনও দোতালাটা মেরে দেবার হাল ছাড়েনি, এবং চেষ্টা করছে হাইকোর্ট যাওয়ার, তারই মধ্যে তালা-টালা ভেঙ্গে তুমি ঢোকার ব্যবস্থা করছো কিনা . . . সেটাই নজর রাখাচ্ছে কাউকে দিয়ে।

সুদীপা বললেন, কেস — এ যখন জিতেছি, তখন সেটা তো আমি করতেই পারি . . . ওদের রেখে লাভ কী ?

আছে দিদি। চঞ্চল বলল। ওরা যেভাবে, যতগুলো তালা ইত্যাদি আটকেছে, সেগুলো ভেঙ্গে, খুলে দোতালায় ঢোকা যে সহজ না, তা ওরা খুব ভাল জানে। সুতরাং তারজন্য বেশ ভাল একটা ব্যবস্থা, লোকজনের প্রয়োজন। আর যখনই ওরা বুঝবে, তুমি সেটা করার উদ্যোগ নিচ্ছ, তখনই ওরা পাড়ার চেনাজানা ছ্যাঁচড়া, মস্তানগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য বলবে। এবং একটা ক্যায়স ক্রিয়েট করবে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। পাড়ার মধ্যে তার ইমপ্যাক্ট কী দাঁড়াবে। বিরাট হৈচৈ-গন্ডগোল . . . চিৎকার-চেঁচামেচি . . . ।

সুদীপা বললেন, সেটাই তো আমি প্রথমদিন থেকে টের পাচ্ছি। টেনশনে রয়েছি কি এমনি !

তবে ওরা ছাড়া আর কেউও যে খেয়াল রাখছে না . . . তাই বা কে বলতে পারে !

আর কে রাখতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

চঞ্চল একটু ভেবে নিয়ে বলল, ওসি-র কথা তো যা শুনলাম, সে-ও তোমাকে টার্গেট করেছে বলেই মনে হচ্ছিল . . . । সুদীপা বললেন, কিন্তু আমার গতিবিধির ওপর ওই লোকটার নজর রেখে লাভ কী ?

বাহ্ তাইতে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করার আরও সুবিধে হবে না ! যদি বোঝে, ওকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপায়ে . . . কিংবা অন্য কারুর হেলপ্ নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছো . . . আগে থাকতে জানলে, তখন সেটা ও ঠেকাবার চেষ্টা করবে . . . সো দ্যাট তুমি ঘুরে আবার ওর কাছেই যেতে বাধ্য হও ।

সুদীপা একটু ভেবে বললেন, তবে ওসি কিন্তু মাইতি কিংবা অপুদের আর পাত্তা দেবে না বলেছে ।

চঞ্চল মাথা নেড়ে একটু হাসির মতো শব্দ করল – হুঁহ্ । তারপর বলল, ক্ষমতা আছে বলে যে ধরণের লোকেরা তোমার বিপদের সুযোগ নিতে চাইছে, তাদের কথা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য বলে ভাবছো ?

সুদীপা তারপরেও বললেন, . . . কিন্তু ওসি তো নিজে থেকেই বলেছে, মাইতি কিভাবে অপুদের সঙ্গেও সাঁট ক'রে এবং . . । চঞ্চল হাত তুলে থামিয়ে দিল সুদীপাকে । কথা বলল একটু পরে ।

শোনো দিদি, তুমি অনেকদিন বিদেশে রয়েছো, তাই অনেকের অনেক কথার মানে এখনও সবটা হয়তো বোঝো না । আমিও তোমাকে তা বোঝানর চেষ্টা করব না । কিন্তু এটুকু মাথায় রেখো – ওই ধরণের লোকেরা স্বার্থসিদ্ধি আর দাঁও মারার ব্যাপারে সাপ-ব্যাঙ সকলের মুখেই প্রয়োজনে চুমু খায় । তুমি কাকে বিশ্বাস করবে !

সুরূপা বলল, তাছাড়া এটা তো ঠিক দিদিভাই যে, ওসি তোমাকে নোংরা ইংগিত করেছে । অন্য কেউ হলে ইনডাইরেকট্যালি টাকার কথা বুঝিয়ে দিত । তোমাকে তার বদলে . . . ।

কিন্তু তাহলেও, আমার ওপর নজর রাখার জন্য . . . কথাটা বলতে বলতে থেমে গেলেন সুদীপা । একটু পরেই আবার বললেন, আচ্ছা . . . ওরা ছাড়া আর কারুর কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমার ওপর নজর রাখার ?

চঞ্চল বলল, দ্যাখো দিদি একটা কথা বলছি ডোন্ট মাইন্ড . . . । তুমি আসলে এখন হচ্ছো . . . যাকে বলে আ সফট্ টার্গেট . . . কেননা, তুমি এন আর আই, তুমি সিঙ্গল, তুমি ওয়েল টু ডু, তোমার নিজস্ব কিছু প্রপার্টি আছে . . . এবং এগুলো ছাড়াও য়্যু লুক কোয়াইট ইয়ংগার দ্যান মোর এজ . . . সেটাও একটা ফ্যাক্টর ।

সুদীপা বললেন, বুঝলাম । কিন্তু তারজন্য আমায় ফলো করবে কেন ?

কারণ . . . যারাই তোমার খানিকটা অধিকার করতে চাইছে . . . তাদের মধ্যেই কেউ দেখতে চাইছে – তুমি আবার অন্য ধান্দা করছো কিনা . . . তোমার সঙ্গে অন্য কারুর যোগাযোগ হচ্ছে কিনা . . . !

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বললেন, দেশে তাহলে মানুষের প্রাইভেসি, সিকিউরিটি বলে কিছু নেই ?

চঞ্চল বলল, দিদি, আমাদের এখানে সব আছে, আবার কিচ্ছু নেই ।

তার মানে !

মানে খুব পরিষ্কার । আইনত সবই আছে । কিন্তু আইনকেও যদি কেনার ব্যবস্থা থাকে . . . তাহলে কী হয় ! বাংলায় একটা কথা আছে জানো তো . . . 'বজ্র আঁটুনি . . . ফস্কা গেরো' ! ক্ষমতাবানদের সঙ্গে যোগাযোগ-দেয়ানেয়ার সম্পর্ক, পলিটিক্যাল কানেকশন . . . এসব যাদের আছে, তাদের সিকিওরিটি, প্রাইভেসি . . . সবই আছে . . . অপরাধ করে তারা মাথা উঁচু করে চলে ।

সুরূপা মাঝখানে বলে উঠল, আচ্ছা তুমি থামবে ! দিদিভাইকে ওসব কথা বলে আরও ঘাবড়ে দেওয়ার কোনও দরকার আছে . . . নাকি তার চেয়ে এখন কিভাবে প্রবলেম সলভ্ করা যায় সেইটা বেশি দরকার ।

সুদীপা একটু আনমনার মতো বললেন, আচ্ছা . . . মাইতিও কি আমার পিছনে লোক লাগাতে পারে !

চঞ্চল বলল, আমার কিন্তু অন্য আর একটা লোকের কথা মনে হচ্ছিল যে ইনডাইরেকট্‌লি একটু থ্রেট ও করেছে . . . ।

কার কথা বলছো ?

দীপক . . . তোমার নন্দাই । চঞ্চল বলল, ভুলে যেও না দিদি . . . ও এখন কলেজে পড়ানো ছেড়ে পার্টি লিডর হয়েছে . . . ভোটে দাঁড়ানর চেষ্টা করছে শ্রীরামপুরে । তোমার শ্বশুরবাড়ির প্রপার্টি-টা কিন্তু খুব বড় টার্গেট ওর । তোমাকে আর অরুনাভকে ও যদি কায়দা করে সরাতে পারে, তাহলে ওই পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে ওখানে দীপকরা বিশাল ব্যাপার করতে পারে . . . ।

কিন্তু তাতেই বা আমার পেছনে লোক লাগাবে কেন ?

সেই একই উদ্দেশ্য । তুমি অন্য কোনো অপশন্-এর জন্য যোগাযোগ করছো কি না . . . !

সুদীপার মুখ থেকে আর কথা সরল না । চিন্তাচ্ছন্ন মুখে রূপার বাড়ির ড্রইংরুমে বসে মনে হল একটা অবিশ্রান্ত দুব্‌দুব্ চলছে বুকের মধ্যে । বারবার মনে আসছে, এ কোন স্বদেশে, সামাজিকতায়, আত্মজনদের কাছে ফিরে আসার জন্য তার নিঃশব্দ প্রাণের আকুতি ! এমন কীই বা আছে তাঁর ! বরং জীবনের থিতু হওয়ার এমন একটা সময়ে, তাঁর না-থাকার ভারটাই তো সব থেকে বেশি । সমসাময়িক বন্ধু বান্ধবদের জীবনযাপন যে সময় থেকে একটি নিবিড় পর্বান্তরের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে, সুদীপা তো তখনই শূন্য হয়ে গেছেন অনেকখানি । ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই নিজেদের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে । সেখানে শেষপর্যন্ত তাঁর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে না । তিনি নিজেও রাখবেন না ।

তাহলে এই দেশ-শহর, ঘরবাড়ি-প্রকৃতি-পরিজন ছাড়া তাঁর আছে কে ! কার কাছে সেই নিঃসঙ্গ শীতল প্রবাসে পড়ে থাকবেন সুদীপা ! কেনই বা থাকবেন ! তাঁর তো সবই রয়েছে এখানে । এমনকী মা পর্যন্ত বেঁচে আছেন এখনও এবং বোধবুদ্ধি ভাবনাচিন্তা, কথাবার্তা . . . সব কিছুতেই রীতিমত সতর্ক এবং সচেতন প্রীতিলতা । মধ্যমা কন্যাটির ব্যক্তি জীবনের দুর্ভাগ্য, যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি, সংসার, দেশ-বিদেশের টানা পোড়েন, উৎকণ্ঠা . . . সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল তিনি ।

কাছেপিঠের মধ্যে মা এবং সপরিবারে ছোট বোন থাকলে, কলকাতায় বসবাসের আর অসুবিধে কোথায় সুদীপার ! অর্থনৈতিক দিক থেকে জলে পড়বেন না । বসবাসের উপযুক্ত ঘরবাড়ি রয়েছে । আর যা কিছু নেই, সেই না থাকার অনিবার্যতাও তো জীবনযাপনের শর্ত । কতজনেরই কত কিছু নেই । চাইলেই পাওয়া যাবে, তাও না । আবার না-চাইতে কতকিছু যে মানুষ পেয়ে বসে আছে . . . ভাবে কি ? চোখ খুললে দিনের আলো, রাতের জোৎস্না . . . ভোরবেলা শুনতে পাওয়া পাখির কণ্ঠ . . . মুখে খাবারের স্বাদ ও গন্ধ . . . গায়ে ভালবাসার মানুষের স্পর্শ . . . ।

সবই তো আছে সুদীপার । তাসত্ত্বেও এই নিরন্তর, অস্থির উদ্বেগ কেন ! উৎখাত হওয়ার বেদনাময় অনুভবে জর্জরিত কেন ! আপনজনের সান্নিধ্যে বসে থেকেও সুদীপার মনে হয়, ঠিক কোথায় যে তাঁর মতো মানুষের নিঃসঙ্গতার দোলাচল . . . এমনকী রূপা এবং চঞ্চলকেও যেন তিনি বোঝাতে পারছেন না ।

বহুদিনের সভ্য উন্নত প্রবাস জীবনের অভ্যাসে তিনি কি আপন স্বদেশভূমির প্রতি বিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছেন !

কিন্তু তাই যদি হয় . . . তাহলে ওই দূরদেশের একাকিত্বকে বিদায় জানিয়ে নিজের দেশের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-পরিবেশ-সংস্কৃতির কাছে ফিরে আসার এই নিবিড় আকুতি কেন ! অথচ . . . ।

সুরূপা এবং চঞ্চলের সামনে বসে কথা বলতে বলতেই সুদীপা টের পান, তিনি একটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে পরিণত হয়েছেন । কাউকেই তিনি নিজের অন্তর-বাহিরের পূর্ণ অবস্থাটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছেন না । নিশ্চয়ই সব মানুষের জীবনে এমন একটা পরিস্থিতির উদয় হয় কখনও যখন নিজেকে অবস্থাকে বোঝানোর মতো ভাষা, মানসিকতা কিছুই থাকে না, দরকার হয় — বুকে নেওয়ার মতো মনন, অনুভব ।

কলিংবেল-এর শব্দটাই যেন ঘরের আকস্মিক থম ধরে যাওয়া অবস্থাটার সমাপ্তি ঘোষণা করল । চঞ্চল নিজেই উঠে গেল দরজা খুলতে । যাওয়ার আগে বলল, নিশ্চয়ই সঞ্জয় । দু-এক পা এগিয়ে ও আবার বলল, দিদি মুডটা ঠিক করো আপাতত . . . প্রসঙ্গ-ক্রমে কথা তো উঠবেই . . . তখন ওর মতামতও পাওয়া যাবে ।

সুদীপার যেন প্রতাপাদিত্য রোডে রূপার বাড়িতে আমার এতোক্ষণ পরে মনে পড়ল, আজ তো এখানে আমার উদ্দেশ্যই হচ্ছে — পুরনো বন্ধু এবং বন্ধুর স্বামী সঞ্জয়কে মিট করা । সুদীপার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শেষদিকের বন্ধু ছিলেন কঙ্কণা । হ্যাঁ . . . ছিলেনই বলতে হচ্ছে বিগত বছর চারেক । হেপাটিক ফেলিওর হয়ে মারা গেছেন কঙ্কণা । প্রায় দশ-বারো বছর আগে একটি অপারেশনের সময় ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে গিয়ে হেপাটাইটিস — সি অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন কঙ্কণা । বেঁচেছিলেন তারপরেও বছর সাত । প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ ছিল সুদীপার সঙ্গে । চারবছর আগে চলে গেছেন বন্ধুটি এক ছেলে এবং স্বামীকে রেখে । ছেলে এখন আমেরিকায় ।

সঞ্জয় নিজেও অবশ্য একা নেই । থাকার কারণও ছিল না । বৃহৎ বিদেশি কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার । অর্থবান-প্রভাবশালী-বন্ধুবৎসল মধ্য পঞ্চাশের সঞ্জয় আবার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে বিবাহবিচ্ছিন্না বীথির সঙ্গে । সুদীপা জানেন, বীথির প্রথম পক্ষের কিঞ্চিত অপরিণত মস্তিষ্কের কন্যাটিকেও সঞ্জয় নিজের মেয়ের মতোই দেখে ।

জিনস্ এবং টিশার্ট পরা সঞ্জয়ের উপস্থিতিতেই যেন এক ঝলক হাওয়া ঢুকল ঘরে । সুদীপা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন আগেই । সঞ্জয় এগিয়ে, নিচু হয়ে জড়িয়েই ধরলেন । সোফায় বসতে বসতে বললেন, কী ভাগ্যিস রূপা-চঞ্চল ডাকল, তা নয়তো তুমি যে এসেছো সেটাই তো জানতে পারতাম না . . . দেখা হওয়ার প্রশ্নও উঠতো না ।

উলটো দিকের সোফায় বসেছেন সুদীপা । বললেন, আর কী করবো . . . রূপা-চঞ্চলই আমার লোকাল গার্জেন এখন । চঞ্চল পানীয়র আয়োজন করার জন্য পাশের ঘরে যাওয়ার আগে বলল, তা যা বলেছো . . . কিন্তু গার্জিয়ানদের তুমি কি আর পাত্তা দিচ্ছো ! নেমন্তন্ন করে না ডাকলে তো আসোই না . . . ।

সুদীপা বললেন, এমনিতেই ঘাড়ে পড়ে গেছি . . . চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে নাকি !

সঞ্জয় সিগ্রেটের প্যাকেট বার করেছিল । কিন্তু না ধরিয়ে বলল, তবু তোমার একজন গার্জেন আছে দীপা . . . আমার মতো . . . । সুদীপা থামিয়ে দিয়ে বললেন, সেই কথাটাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম . . . গার্জেন ছাড়া একা কেন ? বীথি কোথায় ? বীথি আছে . . . মেয়েকে নিয়ে ওর বন্ডেল রোডের বাড়িতে ।

মানে ! তোমাদের চেতলার বাড়িতে . . . তোমরা একসঙ্গে থাকো না !

থাকি . . . আবার থাকি না, দুটোই সত্যি ।

সামান্য ইতস্তত করে সুদীপা বললেন, আর কিছু জিগ্যেস করলে কি বেশি কৌতুহল দেখানো হবে ? হালকা হাসল সঞ্জয় । বললেন, একেবারেই না । তোমরা কি আমাদের কম দিনের বন্ধু গো ?

সঞ্জয়ের মাথায় কাঁচাপাকা চুল । চেহারাও সুঠাম বলা উচিত । কিন্তু মুখের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষন্ন উদাসীনতার ছায়া পড়ে রয়েছে – সেটা এতোক্ষণে খেয়াল করলেন সুদীপা । হয়তো তাঁকে দেখার পরে ওর কঙ্কণার কথা মনে পড়তে পারে, এবং সেই কারণে বিষন্নভাব । কিন্তু তা বোধহয় ঠিক না । কেননা বীথির প্রসঙ্গেই সঞ্জয়ের কণ্ঠে যেন উদাসীনতার ছোঁয়া ।

সুদীপা সোজাসুজি বন্ধুর মতোই বললেন, একটু ঝেড়ে কাশো তো সঞ্জয় । বীথির কথায় তোমার গলা বেসুরো কেন ?

আর কী . . . সুরে বাজছে না . . . সেইজন্যই ।

তার মানে কী সঞ্জয় ? গত বছরও তোমাদের যথেষ্ট ভাল দেখেছি ।

আরে . . . ভাল আমরা এখনও আছি . . . তবে ওই . . . সুর কি সবসময় ঠিক ঠিক মেলে . . . নাকি মেলানো যায় !

আর একটু পরিষ্কার করে বলো । বীথি বন্ডেল রোডের বাড়িতে, আর তুমি চেতলায় . . . !

না-না . . . আমাদের যাতায়াত আছে . . . দুই বাড়িতেই . . . ।

তাহলে সুরের গন্ডগোলটা কোথায় !

ও তো হয়েই থাকে দীপা . . . । আচ্ছা বেশ বলছি । আসলে বিনু (বীথির মেয়ে) কে নিয়ে আমাদের একটা পার্মানেন্ট স্ট্রেস তো আছেই . . . জানো . . . । সেই থেকে মাঝেমধ্যে . . . বাট ইটস্ ওকে . . . । এবার তো চব্বিশ বছর বয়েস ও হল বিনুর . . . ।

সুদীপা বললেন, কিন্তু বিনু তোমাকে এ্যাকসেপ্ট করেছে ভালভাবেই ।

তা তো বটেই । সঞ্জয় বলল । কিন্তু জানোই তো ওর মতিস্থির নেই . . . বিহেভেরিয়াল প্রবলেম আছে . . . তারজন্য থেরাপিও হয় । তাছাড়া অনেকদিন বন্ডেল রোডে ছিল বলে, ও বাড়িতেই বিনু কম্ফর্টেবল ফিল করে . . . । বীথিকেও থাকতে হয় ।

এবং সেটা তোমার ভাল লাগার কোনো কারণ নেই, তাইতো ?

খুব যে খারাপ লাগে সবসময় . . . তাও না . . . তবে ওই আর কী ! . . . হঠাৎই কণ্ঠস্বর পাল্টাল সঞ্জয় । কিন্তু আমার প্রসঙ্গ বাদ দাও তো ! তোমাকে দেখব, কথা বলব বলেই তো আসা . . . খবর সবই রাখি, জানি, কিন্তু . . . ।

সুদীপা মাঝখানেই বললেন, আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে সঞ্জয় । রজত চলে গিয়ে অনেকটাই বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু তা সামলে উঠতে না উঠতেই দেখছি . . . কী বলব . . . কোথাও বুঝি ঠাঁই নেই . . . ।

ওসব বাজে কথা দীপা ।

না সঞ্জয় . . . রজত চলে যাওয়ার পর থেকে যা ফিল করছি তাই বললাম ।

তার মধ্যে সেন্টিমেন্ট, ইমোশন . . . রেস্টলেসনেস নেই ?

একবারে নেই তা বলব কি করে ! কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা তার থেকে অনেক বেশি তীব্র ।

সত্যিই কি দেশে ফিরে আসতে চাও দীপা ?

আমার পরিস্থিতিতে সেটাই তো সব থেকে স্বাভাবিক চাওয়া ।

একই অভিজ্ঞতা কি তোমার ওদেশেও ? আই মিন . . . ঠাঁই না থাকার . . . !

না . . . না . . . না, এই হ্যারাসমেন্ট, চিটিং . . . পদে পদে ঘুষ, মেন্টাল টর্চার, প্রপার্টি মেরে দেওয়া . . . ল্যাক অব সিকিউরিটি . . . এসব ওদেশে কোথায় ! সভ্য-নাগরিক-সামাজিক জীবন যেমন হয় . . . ।

তাহলে তুমি ফিরে আসতে চাও কেন ?

সঞ্জয়ের মুখোমুখি সোজা হয়ে বসে সুদীপা বললেন, এটা তুমি কী বলছো সঞ্জয় !

কেন ?

বিদেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পরিচ্ছন্নতা-ডিসিপ্লিন . . . এসবের কোনোটাই কি নিজের দেশের অলটারনেটিভ হয় সঞ্জয় !

মাথা দুলিয়ে সঞ্জয়, বলল, কী হাতিঘোড়া আশা করো দীপা ! এদেশে ?

আরে . . . কী আশ্চর্য . . . ! বলতে বলতেই একটা শ্বাস ফেলে ঝুম হয়ে গেলেন সুদীপা । পর মুহূর্তেই আবার সোজা হয়ে বললেন, বিদেশবিভুঁইয়ে তো থাকো না . . . তাই তোমাদের বুঝিয়ে বলা মুস্কিল . . . নিজের দেশে মানুষ কী চায় . . . কী পায় . . . । সঞ্জয় তারপরেও বলল, তবু একটু বলার চেষ্টা করো তো ।

সুদীপা বললেন, আন্তরিকতা-আত্মীয়তা-অকুপায়েড থাকা . . . নিজের কালচার-আড্ডা-বন্ধুবান্ধব-নিজের দেশের ওয়েদার, পূজো-অনুষ্ঠান-সামাজিকতা . . . । রোদ-জল-হাওয়া-বৃষ্টি-নদী-গান-কথা . . . যাক্ কী বলব আর . . . ।

এসবের কোনটা ও দেশে পাও না ?

কিছু কিছু পেলেও, আমার মতো অবস্থায় যে নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব . . . তা কতখানি সীমাহীন . . . তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না । ভেবেছিলাম, . . . সত্যি বিশ্বাস করো . . . ভেবেছিলাম দেশও তো মায়ের মতো । জীবন যাপনের জন্য ছেড়ে গেলেও, যে কোনো দিন, যে কোনো সময় ফিরে এলে . . . মা কি তাড়িয়ে দেবে ! নাকি নিজেও এ্যাডজাস্ট করতে পারব না !

কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দের মধ্যেই চঞ্চল এসে পানীয়র সরঞ্জাম রেখে বলল, দাঁড়াও এখনই আসছি বরফ নিয়ে . . . ।

সঞ্জয় ধীরেসুস্থে বলল, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কী হল ?

সুদীপা বললেন, হটাবাহার ।

মানে ?

সবাই হটিয়ে দিতে . . . তাড়িয়ে দিতে চাইছে . . . ।

নিশ্চয়ই সবাই নয় দীপা . . . ।

সরি . . . দ্যাটস ট্রু . . . সবাই নয় । কিন্তু বাস্তব জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সবসময় যদি মনে হয় . . . পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, বিপদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, ঠকানোর আয়োজন হচ্ছে . . . প্রতিকার নেই . . . বিচার চাইতে গেলে রক্ষকই ভক্ষক . . . ।

সুদীপাকে থামিয়ে দিল সঞ্জয় । — এগুলো কোনোটাই পার্মানেন্ট নয় দীপা . . . থাকতে-থাকতে সয়েও যায় . . . ।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যেই সুরূপা ঢুকলো ঘরে । হাতে বড় কাঠের ট্রে । কিছু ভাজাভুজি . . . টার্টার সস, স্যালাড প্লেটে । নীচু টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, সেইটা দিদিভাইকে একটু বুঝিয়ে বলুন না সঞ্জয়দা . . . রেস্টলেস হয়ে লাভ কী ! চলে আসবে বলে যখন ভাবছো . . . একটু রয়ে সয়ে থাকো . . . আলটিমেটালি সবই সেট্‌ল করে যায় । মানুষ তো রয়েছে এসব নিয়েই ।

সুদীপা খুব আস্তে বললেন, আমার মনের অবস্থাটা তোদের সবাইকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না ।

সুরূপা বলল, পারবে দিদিভাই . . . পারবে । এই বর্ষাকাল সময়টাও খারাপ . . . । একটু একটু করে সব ঠিক হয়ে যাবে ।

সঞ্জয় প্যাকেটের ওপর সিগ্রেট ঠুকতে ঠুকতে বলল, দীপার মুস্কিলটা কী হয়েছে জানো . . . একটা সুশৃংখল . . . সোস্যালি স্টেব্‌ল দেশে এতো বছর কাটিয়েছে । আর তার মধ্যে আমাদের এখানে মানুষের ভ্যালুজ এতো উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে যে, তারসঙ্গে এ্যাডজাস্ট করা ডিফিকাল্ট . . . এখানে রাজনৈতিক-সামাজিক চেহারা . . . পার্টিকুলারলি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এমনভাবে বদলেছে যে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঢুকে গেছে খুব বেশি . . . । শিক্ষা নেই কিন্তু লোক বেড়েছে . . . তাকে মদত দিয়েছে রাজনীতি ।

চঞ্চল পানীয়ের সরঞ্জাম নিয়ে গুছিয়ে বসতে বসতে বলল, আচ্ছা . . . এবার তত্ত্ব আর থিয়োরিটিক্যাল ডিসকাশন ছাড়ো । সঞ্জয়দা তুমি সরকারের একজন প্রশাসনিক স্তম্ভই বলা উচিত . . . দিদির সিচুয়েশন তো জানোই . . . এখন কিভাবে সব ঝামেলা মিটিয়ে দিদি সেটলড্‌ হবে, সেই আইডিয়া দাও ।

সুরূপা গুছিয়ে বসতে বসতে বলল, সঞ্জয়দা রাতে খেয়ে ফিরবেন । খিচুড়ি নারকোল ভাজা আর ওমলেট . . . ।

বেশ খানিকক্ষণ খোলামেলা আড্ডাই হল কয়েকদিন পরে । সঞ্জয় ডবলু বি সি এস, পূর্ত বিভাগের সিনিয়ার অফিসার, দক্ষ অধিকর্তা হিসাবেও পরিচিত । ঘুরে ফিরে সুদীপার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় বেশ কয়েকবারই উঠে এলো আলোচনায় । কিছু কিছু নিজেদের অতীত এবং ব্যক্তিগত জীবন বৃত্তান্তও যথারীতি । বাইরে বাদল হাওয়া এবং সাথে সাথে বৃষ্টির অনুষঙ্গেই যেন গোটা কয়েক বর্ষার গানও হল অনেকদিন পরে । গলা মেলালেন সুদীপাও ।

মাঝখানে প্রীতিলতা ফোন করে খবর নিয়েছেন মেয়ের । জানতে চেয়েছেন কখন কিভাবে ফিরবেন দীপা । তখনই জানিয়েছেন, সেই হিমাদ্রি বলে সুদীপার পুরনো বন্ধু টেলিফোন করেছিল । সামান্য অন্যায়বোধে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুদীপা . . . যেহেতু হিমাদ্রি ওদেশ থেকে আসার আগেই ইমেল পাঠিয়েছিল এবং যোগাযোগের অনুরোধ করেছিল । নানান ঝামেলায়, কাজে, উৎকণ্ঠায় বেমালুম বিস্মরণ হয়েছিলেন সুদীপা হিমাদ্রিকে । দু-একদিনের মধ্যেই খোঁজ করেন ওর । প্রায় রাত এগারটা বেজে গেল আড্ডা ভাঙ্গতে । কয়েকদিন পরে অন্যরকম পরিবেশে কিছুটা হালকা বোধ করলেন সুদীপা ।

বুঝতে পারছিলেন, পুরনো বন্ধু এবং একজন সরকারি বড় কর্তার আশ্বাস এবং সাহায্যের হাত বাড়ানো, মানসিক সমর্থন দেওয়া . . . সব মিলিয়েই যেন কিছুটা ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে । সঞ্জয়ের আশ্বাস শুধু যে মৌখিক ছিল না, সুদীপা টের পেয়েছিলেন পরে ।

গাড়িতে সুদীপাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল সঞ্জয় । নিজেই নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, শোনো দীপা . . . যস্মিনদেশে যদাচার । কলকাতায় এসে তোমাকে থাকতে গেলে, এখানকার সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে । উপায় কী ! সুদীপা ফট্ করে বলেছিলেন, তার মানে কি আমার সঙ্গে যেসব অনাচারগুলো চলছে . . . সেগুলো সোয়ালো করে নেওয়া ? আমি তা বলি নি । সঞ্জয় বলেছিল । . . . কিন্তু এখানে তোমায় ঠিক ঠিক লোকগুলোকে চিনতে হবে . . . বেশি রিয়্যাক্ট করলে চলবে না . . . নিজেকে বাঁচিয়েও চলতে হবে . . . কিছু কিছু সইয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই । তারপর থাকেতে থাকতে দেখবে . . . । সুদীপা বললেন, বুঝেছি . . . অভ্যস্ত হয়ে যাব . . . । কিন্তু তার আগে এখন যে গন্ডগোলে পড়েছি . . . উদ্ধার পাব কি করে ! সঞ্জয় বলল, আমার মাথায় আছে দীপা । কিন্তু তোমার সব ডকুমেন্টস্ শুদ্ধ আমার সঙ্গে বসা দরকার . . . দু-একজন উপযুক্ত লোককেও আমি ডেকে নেব . . . কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে ।

কিন্তু সেটা কবে হবে সঞ্জয় ? আমার টানাপোড়েনটা তুমি বুঝতে পারছো ?

পারছি । ফিরে যাওয়ার আগে সঞ্জয় বলল, কালকেই তোমাকে ফোন করছি । গুডনাইট ।

পরের দিন বিকেলে সত্যি সত্যি সঞ্জয়ের টেলিফোন পেয়ে সুদীপা ভাবলেন, তিনি বোধহয় একটু বেশিই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন । . . . আসলে গতকাল রাতে বাড়ি ফিরে প্রাথমিক ভাবে সত্যিই তো তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন । প্রীতিলতা হিমাদ্রির টেলিফোনের কথা বললেও ইচ্ছে করেই সুদীপাকে জানান নি যে, দীপক . . . ওঁর নন্দাই, একেবারে নাকি জামাই বেশে এ বাড়িতে হাজির হয়েছিল । নানান কথার মধ্যে কেবলই নাকি ইংগিত দেওয়ার চেষ্টা করেছে – শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়ির দিকে সুদীপার আর না-যাওয়াই ভাল । বরং ওখানকার সম্পত্তির ব্যাপারে কিছু জানার, বলার থাকলে, যেন দীপককে শুধু একটা মোবাইলে মেসেজ দেন . . . । ও হাজির হয়ে যাবে । দু-তিন দিনে নিজেকে একই সঙ্গে কিছুটা ধাতস্থ এবং ফাইল ইত্যাদি গুছিয়ে প্রস্তুত করে নিলেন সুদীপা । যে কোনোদিনই সঞ্জয় ডাকবে আরও দু-একজনের সঙ্গে বসার জন্য । এখনও দোতালা তালাবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে । বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে নজর রাখছে সুদীপা জানেন । সব সময়ই অনুভব করেন কোথাও একটা অস্থিরতা, উদ্বেগ নিজের মধ্যে রয়েছেই । . . .

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা । ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন । প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত । 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৫

সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুম এলনা শিঞ্জিনির। সে খালি ছিপছিপে চেহারার কোঁকড়া চুলের ছেলেটির চোখদুটোর কথা ভাবতে লাগল। যদিও সে বড় লাজুক, ভালো করে চোখদুটোর দিকে তাকাতেও পারেনি, তবু সে দেখেছে, সরোজ স্যারের বাড়ির মোমবাতির আলোয়, ট্যাক্সিতে ঝুঁকে পড়া রাস্তার আলোয় আশ্চর্য গভীর দুটো চোখ। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে ঘরের লাগোয়া বারান্দায় এসে দাঁড়ালো শিঞ্জিনি। আকাশ মেঘে ভর্তি। কি এক অজানা রোমাঞ্চে চারদিক যেন মুখ গুঁজে আছে জমাট অন্ধকারে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। শিঞ্জিনি হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল তাদের। প্রথম ফোঁটাটা ছুঁতেই সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল যেন। শিঞ্জিনি এক নিমেষে হু হু করে উড়ে গিয়ে মিশে গেল মেঘেদের ভীড়ে। না না সে নয়, তার মনটা। খুব একটা কষ্ট বুকের গভীর থেকে উঠে আসতে শুরু করেছে মন জুড়ে। তার দু'কান, নাক গরম হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। শিঞ্জিনির মনে হল যে সে পাগল হয়ে যাবে। এই অভূতপূর্ব আবেগের তোড় তাকে ঠেলে বের করবে চেনা ঘেরাটোপ থেকে। সে বৃষ্টি মাড়িয়ে, রাত অগ্রাহ্য করে চলে যাবে ঐ চোখেদের কাছে। তার যেন অনেকদিন ধরে অনেক কথা বলবার আছে তাদের। যেন যতক্ষণ না বলা হচ্ছে, শান্ত হবেনা বুকজোড়া এই ঢেউ। শিঞ্জিনি ঠিক করল, সে ছাদে যাবে।

লবিতে খাওয়ার টেবিলের উপর রাখা আছে চাবির গোছা। গোছাটা হাতে নিতে নিতে ভীষণ একটা ভয় আর বিস্ময় ঘিরে ধরল তাকে। এতো রাতে ছাদে যাবে সে ? একা ? কেন ? আগে কখনও যায়নি তো সে এমন। তবু কি এক অদম্য আকর্ষণে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল তার পা। যন্ত্রের মতো চাবি খুলে সে ছাদে গিয়ে দাঁড়ালো। একা। টিপটিপ বৃষ্টিরা পরম আদরে ভিজিয়ে দিতে লাগল সব বিষণ্ণতা। আহ ! এখন আরাম লাগছে একটু। শিঞ্জিনি ছাদেই বসে পড়ল হাঁটুদুটোকে মুড়ে থুতনির কাছে এনে। তবে, এই-ই কি ভালোবাসা ? এই-ই কি প্রেম ? এই কি তার খোঁজের শেষ না কি তার আসল খোঁজের এই-ই সূচনা ? হঠাৎ ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল শিঞ্জিনি। পুরোনো ব্যথা টেনে ক্লান্ত তার চোখের জলেরা মুক্তির আনন্দে মিশে যেতে লাগল বৃষ্টির শরীরে। সেরাতে অনেকক্ষণ পরে নির্ভার শিঞ্জিনি নেমে এল ছাদ থেকে। এখন বড় ঘুম পাচ্ছে তার।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে আশ্চর্য হয়ে গেলেন উমা। ছাদের সিঁড়িতে জল ! সিঁড়ি ধরে এগোতে অবাক ভাবটা বাড়ল। এ কি ! দরজাটা খোলা ! চাবি লাগানো তালাটা আলতো ঝুলছে কড়া থেকে। তাহলে কি কাল রাতে ছাদের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন তিনি ? কিন্তু এমন তো কখনও হয়না তাঁর। চিন্তাটা মাথায় নিয়ে কলঘরে যেতে দ্বিতীয় ধাক্কাটা লাগল। ছোটকুর ম্যাক্সিটা বালতিতে ডোবানো। এটা পরেই তো কাল রাতে শুতে গেল মেয়েটা ! এখনও ঘুমোচ্ছে, তাহলে ম্যাক্সিটা ছাড়ল কখন আর কেনই বা ? আর ভাববার সময় পেলেন না উমা। বিমল গলা তুলে ডাকছেন, "কি গো, একবার শোনো তাড়াতাড়ি"।

"ছোটকুকে বলেছ তো আজ বিকেলে অলক চ্যাটার্জীরা আসছেন ?", বিমল জানতে চান। "বলেছি তো, কিন্তু মেয়ের এক গোঁ যে অমন সং সেজে কারও সামনে বসবেনা সে। বললে বলছে অমন ধারা বিয়েতে আপত্তি আছে ওর। যাকে চেনেনা জানেনা, তাকে সারাজীবনের জন্য ওভাবে মেনে নিতে পারবেনা। তাছাড়া এখন বিয়ের সময়ও নেই তার। আরও পড়তে চায়", এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে জুলজুল চোখে রক্ষণশীল স্বামীর দিকে তাকালেন উমা। "কি ? এমন বিয়ে করবেনা ? নিজে পছন্দ করবে বুঝি ? কিন্তু এ বাড়িতে তো তা চলবেনা উমা। তোমার মেয়ের তো এতদিনে সেটা বুঝে ফেলা উচিত। আর আরও পড়বে মানে কি ? গ্র্যাজুয়েশন করছে, অলকবাবুরা কমপ্লিট করতে দেবেনও বলেছেন, তাহলে অসুবিধাটা

কোথায় ? ছোটকু কি পি এইচ ডি করবে নাকি ?" "হ্যাঁ বাবা, আমি পি এইচ ডি করতে চাই। ওটা আমার স্বপ্ন বলতে পারো। এখন বিয়ে করে নিজের হাতে সে স্বপ্ন আমি ভাঙতে পারবনা।", বিমল অবাক হয়ে দেখলেন ঘুম ভাঙা চেহারায় কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মেয়ে। "বেশ, অলকবাবুদের সঙ্গে কথা বলে দেখব। ওনারা ভদ্র পরিবার, রাজী হয়ে যেতেও পারেন। কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কোথায় ? তাছাড়া হুট বললেই তো আর বিয়ে হচ্ছেনা। আগে ওনারা আসুন, কথাবার্তা হোক", মেয়ের ভঙ্গি দেখে সুর নরম করেন বিমল। "না বাবা, বিয়ে এখন আমি করবনা। তাছাড়া এভাবে বিয়ে করায় বিশ্বাস নেই আমার। যাকে বিয়ে করব তাকে আগে ভালোবাসতে হবে আমায়। ভালোবাসাহীন ভাবে কোনো সম্পর্ক গভীরভাবে শুরু হতে পারেনা", নম্র অথচ দৃঢ় মত ভেসে আসে। "চুপ ! একদম চুপ ! অনেকক্ষণ সহ্য করছি বাচালতা। শোনো, আজ বিকেলে অলকবাবুরা আসছেন আর তুমি তাদের সামনে যথোচিত বসবে, ব্যস ! অন্য কোনো কথা শুনতে চাইনা আমি",

কথাগুলো বলেই বাথরুম রওনা দেন বিমল। শিঞ্জিনি স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে মা-র দিকে। স্বভাবনিরীহ উমার বেশীক্ষণ সহ্য হয়না সে দৃষ্টি। তিনি চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে চলে যান রান্নাঘরের দিকে। ঘরে ফিরে ভাবতে বসে শিঞ্জিনি। নাঃ, এভাবে কিছুতেই সং সেজে বসতে পারবেনা সে। এমন করে বিয়ে সে করতে পারবেনা। ভালোবাসা, জীবনসঙ্গী নিয়ে তার যে অন্যরকম স্বপ্ন ! সে স্বপ্ন এতো সহজে কিভাবে ভাঙবে সে ? কিন্তু কি করবে সে ? দুপুর অবধি ক্লাস। তারপর কি কোনো বন্ধুর বাড়ি চলে যাবে নাকি লাইব্রেরিতে কাটিয়ে দেবে বিকেল পর্যন্ত ? আর ভাবতে পারছেনা সে। উফ! আর ভাবতে পারছেনা সে। মাথাটায় খুব ব্যথা আর ভার-ভার ভাব, গা-টাও ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে। জ্বর আসছে নাকি কাল রাতে ভিজে ? শিঞ্জিনি বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। চা দিতে এসে শুয়ে থাকা মেয়েকে ডাকতে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই উমা টের পেলেন বেশ জ্বর এসেছে। তিনি বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, "আজ ওনাদের বারণই করে দাও। ছোটকুর খুব জ্বর এসেছে"। বারণ করে দেন বটে, কিন্তু অফিস বেরোনো অবধি রাগে গুম মেরে থাকেন বিমল। ওদিকে আধো তন্দ্রায় বিছানায় শুয়ে শিঞ্জিনি ভাবতে থাকে, কালকের মধ্যে জ্বর সেরে যাবে তো ? কাল সুনীলের কাছে যাওয়া, কাল সেই চোখের কাছে যাওয়া। পারবে তো সে ?

* * * * *

আজ সকাল সওয়া দশটার মধ্যেই কলেজের সামনে পৌঁছে গেছে নীল। অন্যান্য দিন পৌনে এগারোটায় পৌঁছলেই চলে তার। কলেজ শুরু এগারোটায়। আসলে কলেজের মর্ণিং সেকশনটা মেয়েদের। সাড়ে দশটায় ছুটি হয়। নীলের ইচ্ছা ঐ মেয়েদেরও কালকের ঘটনাটা বলে আন্দোলনে সামিল করা। আজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাতেই এক লিফলেট লিখে ফেলেছে সে, তারপর অনেকগুলো ফটোকপি করিয়ে নিয়েছে। নীল দেখেছে, অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষও ফটোকপি করাকে জেরক্স করা বলে। আসলে জেরক্স কোম্পানি প্রথম ফোটোকপিয়ার মেশিন তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। তাতেই মেশিনটার চালু নাম ওরকম হয়ে গেছে। যদিও এখন অনেক কোম্পানিই ফোটোকপিয়ার বের করেছে, তবু নীল দেখেছে ক্যানন কোম্পানির ফোটোকপিয়ারে ফোটোকপি করাকেও লোকে জেরক্স করা বলছে। এ'রকম টুকটাক ভুল আরও চালু আছে। যেমন, জামা-কাপড় কিনতে যাওয়াকেও লোকে মার্কেটিং বলে। আসলে মার্কেটিং মানে বাজারে গিয়ে শাক-সবজি, মাছ-মাংস জাতীয় জিনিষ কেনা। আবার মার্কেটিং মানে বিপণণও বটে। জামা, কাপড়, জুতো ইত্যাদি কেনা হল শপিং যা অনেকেই বলেনা। বন্ধুরা এখনও এসে পৌঁছয়নি কেউ। অপেক্ষা করতে করতে আরেকটা কথা মাথায় এল নীলের। অধিকাংশ মানুষ উপহার দেওয়াকে বলে প্রেজেন্টেশন, অথচ ওটার মানে কোনোকালেই উপহার নয়, বরং উপস্থাপনা। উপহারের ইংলিশ প্রতিশব্দ প্রেজেন্টস বা গিফট। আরেকটা ব্যাপার খুব মজার। বেশীরভাগ বিবাহিত বাঙালি নারী-পুরুষ কিছুতেই নিজের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীকে স্বামী বা স্ত্রী বলেননা। বলেন, হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ। এটা খুব হাস্যকর মনে হয় নীলের। যদিও বরের ভালো বাংলা হিসাবে স্বামী বা কর্তা শব্দগুলোকে মেনে নিতে অসুবিধা আছে তার। কেমন যেন পুরুষতন্ত্রের উৎকট গন্ধ শব্দগুলোর গায়ে।

“কি রে কখন এলি ?”, পিঠে চাপড়টা পড়তেই রঞ্জনকে দেখা গেল। পাশে সুপর্ণা, চৈতালি আর তিয়াসা। একই পাড়ায় থাকে ওরা, গিরিশ পার্কের দিকে। সুপর্ণার দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নরম হয়ে এল নীলের। সুপর্ণাকে খুব ভালো লাগে তার যদিও স্বভাবলাজুক নীল এখনও ভালো করে আলাপই করে উঠতে পারেনি ওর সঙ্গে। মেয়েটা আজও একটা সবুজ রঙের সালোয়ার পরে এসেছে। প্রায়ই পরে, বোঝাই যায় সবুজ প্রিয় রঙ ওর। নীলেরও খুব ভালো লাগে সুপর্ণাকে ওই রঙের পোশাকে দেখতে। কেউ জানেনা, নীল মাঝে মাঝে মনে মনে সুপর্ণাকে সবুজ মেয়ে বলে ডাকে। – “এই তো কিছুক্ষণ, সুদীপ কোথায় ?”, সম্বিত ফিরিয়ে জানতে চায় নীল। – “এসে যাবে ঠিক। তা গুরু, তুমি অমন ভাসা ভাসা চোখে মর্ণিংয়ের মেয়েদের বেরোনোর দিকে চেয়ে আছো কেন বাওয়া ?” – “না, আসলে ভাবছিলাম ওদেরও যদি ইস্যুটাতে সামিল করা যায়, তবে চাপটা জোরদার হয়”, নীল বুঝিয়ে বলে। ডাকাবুকো চৈতালি লুফে নেয় প্রস্তাবটা, “গুড সাজেশন। ঐ তো বেরোচ্ছে ওরা। এই নীল, ক’টা লিফলেট দে তো। আয় তিয়াসা”। তিয়াসা আর চৈতালি ঐ মেয়েদের কাছে গিয়ে ঘটনাটা বলতে থাকে। কিছু মেয়ে চলে গেলেও জনা কুড়ি এসে দাঁড়ায় নীলেদের দলে। ইতিমধ্যে সুদীপও এসে যায় বন্দনাকে নিয়ে। আরও ছেলে-মেয়ে এসে গেলে নীলেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়, বোঝাতে থাকে কলেজ করতে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের। কিছুক্ষণ পরে অবাক হয়ে যায় নীল। সামান্য কয়েকজন ভেতরে চলে গেছে বটে, কিন্তু বিশাল একটা সংখ্যা নীলেদের পাশে। এগারোটা বাজতে বাজতে ভীড়টা বেশ বড় হয়ে গেল। হঠাৎ দেখা গেল, রঞ্জিতদা আসছে, সঙ্গে তার পার্টির কিছু ছেলে-মেয়ে। কলেজে ঢুকতে গিয়ে এক ঝলক দাঁড়ায় রঞ্জিতদা; বুঝে নেয় ব্যাপারটা, তারপর গম্ভীর মুখে চলে যায় ভেতরে। নীল বোঝে, সংঘাতের সময় উপস্থিত। এগারোটা পনের নাগাদ প্রিন্সিপাল বেরিয়ে এলেন, “কি ব্যাপার ? তোমরা কেউ কলেজে ঢোকোনি কেন ? এনি প্রবলেম ?” ভীড়ের গুণগুণটা মূহূর্তে চুপ করে যায়। তারপর শোনা যায় নীলের দীপ্ত, শান্ত স্বর, “স্যার, কাল বন্দনার সঙ্গে যা হয়েছে, তা এতক্ষণে নিশ্চয় আপনার অজানা নয়। আমরা মনে করি, এ ঘটনা অতীব নিন্দনীয়। আমাদের দাবি একটাই, রঞ্জিতদাকে বন্দনার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে”। – “ দ্যাখো, এ আলোচনা তো কলেজের মধ্যেও করা যায়। তোমরা ভেতরে এসো”। – “মাফ করবেন স্যার, যতক্ষণ না রঞ্জিতদা ক্ষমা চায়, আমরা ভেতরে ঢুকবনা। বলতে খারাপ লাগছে স্যার, এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, কলেজ কর্তৃপক্ষ সেখানে নীরব দর্শক মাত্র”। – “হুঁ”, বলে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রিন্সিপাল ভেতরে চলে যান। মিনিট কুড়ি কেটে যায় কি হবে সে নিয়ে গুঞ্জন চলতে থাকে জমায়েতে। – “কেসটা কি হল বল তো ?” , রঞ্জন অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। – “দাঁড়া, রঞ্জিতদা আসছে”। রঞ্জিতদা গোটা দশেক ছেলেকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় ভীড়ের মুখোমুখি। তারপর ধীরে ধীরে বলে, “সুদীপ, কাজটা কি ভালো করছ ? এভাবে পার্টির নির্দেশের বাইরে জমায়েতে সামিল হচ্ছ, এটা ঠিক ? তুমি পার্টি ফ্রন্টে এ’নিয়ে কথা বলতে পারতে”। সুদীপ দ্রুত চোখ নামিয়ে নেয়। উত্তরটা দেয় নীল, “পার্টির মধ্যে এ নিয়ে ও কথা বলতে যাবে কেন ? অন্যায়টা তো বাইরের কেউ করেনি। করেছো তুমি। তাছাড়া এই জমায়েত তো রাজনৈতিক নয়”। নীলের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে রঞ্জিতদা ।

তারপর বলে ওঠে, “নীল, তুমি কি এই ইস্যুতে কোনো ফ্রন্ট গড়তে চাইছ ? যদি বলি বিরোধীদের ইন্ধন আছে তোমার পেছনে, ভুল বলা হবে ?” নীল বোঝে, স্বভাব রাজনীতিক রঞ্জিতদা গোটা ইস্যুটাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। সে শান্ত গলায় উত্তর দেয়, “আমি তো বললামই এই প্রতিবাদ ইস্যুভিত্তিক ও একটাই। তোমাকে তোমার আচরণের জন্য বন্দনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।” ভীড় থেকে এবার সজোরে “ঠিক” “ঠিক” আওয়াজ ওঠে। অনেকেই সাহস পেয়ে অনেক কিছু বলতে চায়। ধুরন্ধর রঞ্জিতদার অসুবিধা হয়না হাওয়া বুঝতে। সে সরাসরি বন্দনাকে প্রশ্ন করে, “বন্দনা, তুমিও কি তাই চাও ?” কয়েক সেকেন্ডের দ্বিধা কাটিয়ে বন্দনা আলতো একটা হ্যাঁ ভাসিয়ে দেয়। – “বেশ, ঠিক আছে। কালকের ঘটনার জন্য আমি অনুতপ্ত। বন্দনার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। বন্দনা, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড”, এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে এক ঝলক নীলকে দেখে রঞ্জিতদা। তারপর কলেজে ঢুকে যায়। সবাই হইহই করে ওঠে। অভিনন্দন জানাতে

থাকে নীলকে। এতোবড় একজন ছাত্রনেতাকে যে এভাবে ক্ষমা চাওয়ানো যেতে পারে, ভাবেনি কেউই। সুদীপ জড়িয়ে ধরে নীলকে, “থ্যাংক ইউ নীল”। আস্তে আস্তে এবার সবাই কলেজে ঢুকতে শুরু করে হঠাৎ নীল পিঠে কার স্পর্শ পায়। জয় ! – “বেশ বলেছিস, বেশ করেছিস, বেশ, বেশ, বেশ” – স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কথাগুলো বলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে কলেজে ঢুকে যায় জয়।

সেদিন বিকেলে কলেজ থেকে বেরোতে গিয়ে থমকে গেল নীল। গেটের কাছে রঞ্জিতদা দাঁড়িয়ে, সঙ্গে দলবল। রঞ্জিতদা বলতে থাকে, “তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি নীল। আজ তুমি যেটা করলে তাতে উতরে গেলে বটে, কিন্তু জেনো যে কোনো অরাজনৈতিক আন্দোলনেরই স্থায়িত্ব খুব কম। আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদে সফল হয় তখনই, যখন তার একটা রাজনৈতিক ভিত্তি থাকে। তুমি ভালো ছেলে, সৎ, তোমার উদ্যম আমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি আমাদের ইউনিয়ানের সদস্যপদ নিচ্ছো না কেন ? তোমার মতো ছেলে আমাদের প্রয়োজন নীল”। – “কিছু মনে করোনা রঞ্জিতদা। তোমার বুঝতে ভুল হচ্ছে কোথাও। আমি কোনো আন্দোলন সংগঠিত করিনি, করতেও চাইনি। আমরা দলবদ্ধভাবে একটা অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেছি মাত্র। আর রাজনীতি ? ওতে আমার আগ্রহ নেই রঞ্জিতদা, ওটা তোমাদেরই থাক”, কথাগুলো উগরে দিয়েই পা চালায় নীল। কয়েক পা এগোতেই দেখে জয়, হাসিমুখে। গজদাঁতে ঝিলিক তুলে চোখ মটকায় জয়, “বেড়ে বলেছিস। বাঃ ! বেশ, বেশ”। একটু হেসে জয়ের কাঁধে হাত রাখে নীল। এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে জয়, চোখের তারায় মজা। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় জয়, “নীলুবাবু, ধাক্কাটা সামলাতে পারবে তো ?” নীল অবাক হয়ে যায়। কোন ধাক্কার কথা বলছে জয় ? রঞ্জিতদার সঙ্গে সংঘাতের আফটার এফেক্ট ? প্রশ্নটা করতেই চওড়া হয়ে যায় জয়ের হাসি, “উঁহু, ধরতে পারিস নি”, জয় যেন একটা ছন্দে মাথা দোলাতে থাকে, “সে ধাক্কার কথা বলিনি, আমি বলছি জনপ্রিয়তার ধাক্কার কথা। আরে শালা, এই মাপের একটা ক্যান্টার করে ফেললি, কতো পপুলার হয়ে গেলি বল তো রাতারাতি ? পপুলারিটির একটা ধাক্কা আছে জানিস তো ? সে ধাক্কা খুব মারাত্মক রে, অন্য কেউ নয়, শালা পপুলার মালটাই সবার আগে পড়ে যায় সেই ধাক্কাতে”। নীল হেসে বলে, “পারিসও বটে। না রে, আমার ওসব কিছু হবেনা, ভাবিসনা"। -" হুঁ, তাই মনে হয় অবশ্য," জয় একটু চুপ করে থাকে, তারপর নাটকীয়ভাবে বলে ওঠে," অ্যাই বল তো, বুঝলাম কি করে যে তুই ডি-রেইলড হবি না ?" নীল মাথা নাড়ে। সত্যিই বোঝেনি সে। -" তোর চোখ আর হাসি দেখে রে শালা, তোর চোখ আর হাসি দেখে"। নীল খুব অবাক হয়ে যাচ্ছে দেখে এক হ্যাঁচকায় তাকে পথে টেনে নামায় জয়। তারপর "যা যা বাড়ি যা", বলে নিজেই চলতে শুরু করে।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার ‘খেলার ছলে’ পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই ‘দেশ’, শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

স্বর্ভানু সান্যাল

পর্ব ১০

চোর ও চুরি

নিশিকুটুম্ব কথাটা শুনেছেন নিশ্চয় ? নিশিকুটুম্ব মানে রাতের অতিথি মানে সাদা বাংলায় চোর। এই চোরেদের নিয়ে একটা চোরা আগ্রহ আমার আপনার সকলেরই আছে। চুরির নিদর্শন সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু চোরেদের দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। কারণ চোরেরা অনেকটা ভূতেদের মত রাতের দিকে বাড়ি আসে। কিন্তু ভুত ও চোরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ভূতেদের মানুষের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে কোনো আগ্রহ নেই। অন্যদিকে মানুষের সকল স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর বা জঙ্গম করে দিতেই মানে সাদা বাংলায় নিয়ে কেটে পড়াতেই চোরেদের বেশি আগ্রহ। গৃহস্থের ওপর উৎপাত করে তার প্রাণনাশ করাই ভূতেদের উদ্দেশ্য আর গৃহস্থ যখন চিৎপাত হয়ে ঘুমচ্ছে তখন তার ধননাশ করা চোরেদের উদ্দেশ্য ও বিধেয়। ভুতেরা ঘাড় মটকায়, অন্যদিকে চোরেরা ঘাড় ভাঙে। চোরেদের একটা সৎগুণ হল তারা গৃহস্বামী বা স্বামিনীর ঘুমে মোটেই ব্যাঘাত ঘটায় না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটাখাটনির পরে যে একটু শান্তির ঘুম লাগে সেটা সহৃদয় চোরেরা বোঝে বলেই তারা গৃহস্থের দরজা ভাঙে নিঃশব্দে। ঘুমের মধ্যেই যখন আপনি আপনার সুন্দরী প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ঐ যাকে বলে একটু সদালাপ করছেন আর ভাবছেন "স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা, জাগিও না আমায় জাগিও না", সেই ফাঁকে হালকা করে চোরেরা আপনাকে এমন হালকা করে দেবে আপনি জাগবেনও না, জানতেও পারবেন না। চোরেদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল সিঁধেল চোর। তাঁরা একটা সিঁধ কাঠি নিয়ে ঘোরে। যাদুকাঠির মতই সিঁধকাঠির ম্যাজিকে সব গোপন দরজা খুলে যায়। সেই পথেই চোরেদের প্রবেশ আর আপনার গৃহাভ্যন্তরস্থ জিনিসপত্রের নিষ্ক্রমণ। উৎকৃষ্ট মানের সিঁধকাঠি পাওয়া ছিল ভারি শক্ত। বংশানুক্রমে চোর ছেলে চোর বাবার থেকে প্রাপ্ত হত। যাকে বলে একেবারে উত্তরাধিকার। সিঁধ কাঠির জোরে সিঁধেল চোরেরা গায়ে তেল মেখে রাতের বেলা গোপন কম্মটি সেরে দিনের বেলা গোঁফে তেল দিয়ে ঘুমতো। চোরগিন্নি আর চোরের মা তখন "চোরের মায়ের বড় গলা" প্রমাণ করতে চুরির মালের ভাগ বাঁটোয়ারা করত। কিন্তু এই জাতীয় চোর বিলুপ্তপ্রায় হল সিঙ্গল ফ্যামিলী হোম ছেড়ে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরী হওয়ার পর। কারণ সিঁধ কেটে সুড়ঙ্গপথেই এঁদের অভিসার। কিন্তু তাতে নিচের তলার ফ্ল্যাটের বেশি এগুনো যায় না। এর পরে চোর ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ইন্টারেষ্টিং হল পকেটমার। তাদের অফিসঘর শুনশান বাড়ি নয়, বরং বাস ট্রাম ষ্টেশানের মাঝেই তারা আড়ি পেতে থাকে। রাত্রিব্যাপারী নয়, দিনের বেলাতেই তাদের যত কারবারি। বাসের মধ্যে ভীড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হচ্ছেন, নিজের পা'য়ে দাঁড়িয়েছেন না লোকের পায়ে ঠাহর করতে পারছেন না, এরকম ঘোরতর সময়েই তাদের নিপুণ শিল্পতে আপনি অল্প হয়ে যাবেন ঠাহর করতেই পারবেন না। এঁদের একটা সদগুণ হল আপনার পকেটের মালকড়ি ছাড়া আপনার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে এনারা কানাকড়িও মাথা গলাবেন না। মানিব্যাগ হলে মানিব্যাগ, মোবাইল হলে মোবাইল যা আপনি মন খুলে স্বেচ্ছায় জনস্বার্থে দিতে চান সেটাকে পকেটস্থ করলেই হল, পকেটমার মহাশয় আপনাকে এতটুকু অপদস্থ হতে না দিয়ে ঠিক উঠিয়ে নেবে। তবে বাঘ সিংহের সাথে সাথে এই প্রজাতির চোরেরাও বিলুপ্তপ্রায়। কারণ মানুষের মোটো হয়ে গেছে আজ ধার, কাল নগদ। মানিব্যাগ গুলো হয়ে গেছে ঋণাধার। অর্থাৎ কিনা মানিব্যাগে ক্যাশের বদলে থাকে হরা পিলা নীলা হরেক রঙের রকমারি ক্রেডিট কার্ড। ক্যাশে যেমন সর্বজনসম্মতি, কার্ডে তেমন নয়। আরও এক ধরণের চোর আছে যাদের নাম ছ্যাঁচোড়। চোরেদের সমাজে এরা নিতান্তই দলিত। বিভিন্ন রকমের ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়ায় এদিক সেদিক। আরও অন্য চোর আছে। চোরেদের সাথে চালাকি করতে পারে যারা তাদের বলে বাটপাড়। চোরাই মাল চুরি করে এরা চৌর্যবৃত্তিতে নিজেদের শৌর্য প্রদর্শন করে। চুরি যে লুকিয়েচুরিয়েই করতে হবে এমন মানে নেই। তবে আর এক ধরনের চোর আছে যারা দিন দাহারে বুক ফুলিয়ে চুরি করে। তার নাম রাজনৈতিক নেতা। আর সামান্য চক্ষুলজ্জার খাতিরে যারা টেবিলের তলা দিয়ে চুরি করে তাদের নাম সরকারি অফিসার।

আগেকার দিনে চোরেরা গায়ে তেল মেখে বেরত। কারণ চোরেদের সমাজে তেমন সুনাম নেই। শাস্ত্রে লেখা আছে "চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা"। ধরা পরলে ধড়ে উত্তম মধ্যম পড়ে। তাই অন ডিউটি থাকাকালীন ধরা পড়া থেকে বাঁচতে তেল চুকচুকে খালি গা ভীষণ কাজে দিত। ছোটোবেলায় একবার স্বচক্ষে ধরা পড়া চোর দেখেছিলাম। ল্যাম্পপোষ্টে বাঁধা। নিতান্তই খেতে না পাওয়া শীর্ণ চেহারা। চোর হিসেবে বিশেষ চৌকস নয় তার প্রমাণস্বরূপই বোধ হয়। গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা পথচলতি তাকে পিটিয়ে দিয়ে কর্তব্যসাধন করছে ও সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে। সাপের মতই মানুষেরও একটা বিষথলি থাকে, আর মাঝে মাঝে সেই বিষ ঝাড়ার সুযোগ পেলে বিশেষ কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা। তাই ল্যাম্পপোষ্টে বাঁধা চোরটা বিশেষ জনকল্যাণ সাধন করছিল বলে আমার বিশ্বাস।

তবে সব চুরিতে যে পিটুনি জোটে তেমন নয়। যেমন মনচুরি। দ্বাপরযুগে গোপিনীদের monchuri করত এক রাখালবালক। কলিযুগে গোপিনীদের monchuri করে কিছু বাইকপালক। তারপর ধরুন বইচুরি। বই পড়ার জন্য চুরি করলে সেই চুরিকে আমরা ক্ষমা ঘেন্না করে নিই। কথাতেই আছে বই আর বৌ পরের ঘরে গেলে আর ফেরত আসে না। বউয়ের সামনে এবং বউ-এর সম্বন্ধে মুখ বন্ধ রাখাই ভাল। বই সম্বন্ধে এই সত্যতা আমি নিজেই পরখ করে দেখেছি। আমার বই যারা নিয়ে গেছে তারা আপন করে নিয়েছে। আমি নিজেই অনেকের বই নিয়ে এসে আত্মীয়তা স্থাপন করেছি। ফেরত দিই নি। ইন ফ্যাক্ট আমার নীতি হল আমার প্রত্যেকটা বই গায়েব হওয়ার সাথে সাথে আমি অন্যের দুটো করে বই গায়েব করব। এটাকে নীতি না বলে দুর্নীতি বলাই ভাল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চুরি আমি হামেশাই করে থাকি। যেমন মন্দিরে গেলে হামেশাই চটি জোড়া চুরি হয়ে যায়। আমি অবলীলায় অন্যের চটি পায়ে গলিয়ে বিগলিত প্রাণ হয়ে চলে আসি। এই ব্যাপারে একটা ছোট গল্প মনে পরছে। এক ভদ্রলোক মন্দিরের বাইরে ঘুরঘুর করছেন দেখে অন্য একজন তাকে জিগেস করলেন "কি খুঁজছেন ?" ভদ্রলোক বললেন "এই চটিজোড়া খুঁজছি"। অন্যজন কালবিলম্ব না করে বললেন "আসার সময় পরে এসেছিলেন তো ?" তাই নিজের চটি চটকে গেলে অন্যের চটি চুরিকে ঠিক জোচ্চুরির পর্যায়ে ফেলা হয় না। তবে চোর ও চুরি নিয়ে বলতে গেলে আর এক ধরণের চুরির কথা না বললে অন্যায় হবে। সেটা হল গান চুরি বা সুর চুরি। যারা একাজে পারদর্শী তাদের বলে প্রীতম।

তবে চোরেদের জাতবিচারে এখন একেবারে কুলীন বামুন বলা যেতে পারে যাদের তারা হল ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। এমনিতে হ্যাকিং করা মানে প্রোগ্রামিং করা হলেও বদ মতলবে হ্যাকিং করে এই কালো টুপি পরিহিতরা। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই মধু ছড়িয়ে যোগাড় করে নেবে আপনার ডিজিটাল ব্যাঙ্কের চাবি। আর হাপিশ করে দেবে আপনার প্লাস্টিক মানি। হাপুস নয়নে কাঁদা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না আপনার। এই বিশাল প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে চোরেদের স্কিলসেট আপগ্রেড করে এই ডিজিটাল চুরিবিদ্যা শেখা উচিত। জীবিকা হিসেবে চৌর্যবিদ্যাকে ধরে রাখতে হলে হ্যাকিং শেখানোর জন্য সরকারী ভোকেশানাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট খোলা উচিত।

তাই চুরি করুন। অবশ্যই চুরি করুন। আপনি শিশু হলে মাখন চুরি করুন, কিশোর হলে মন চুরি করুন আর জুড়ি খুঁজে পেয়ে গেলে বাকি জীবনটা করুন জোচ্চুরি।

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দূর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পারিজাত ব্যানার্জী

"এক-কম"

পর্ব ১

এই, এই পড়ল এক্কা ! আবার। বারবার। যত চাইছি, ছক্কা ফেলতে, ঘুরে ফিরে ঠিক দেখো, কেমন এক্কাই পড়ছে ! এর একটা হিল্লে তো হওয়া উচিত – তাই না ? তা না ! খালি এক্কা, আর এক্কা ! ওই দেখি খালি আমি – আমার যেন আর কোনো কাজ নেই কোনো ! পাশের বাড়ির টুবলুটাও খুব শেয়ানা ! এই সময়ই আবার ছড়া ধরেছে – "এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে। ওই দেখো ভাই চাঁদ উঠেছে!" মরণ! পারিনা !

অথচ ছোট্টবেলায়, এই এক নম্বর হওয়ার জন্যই কত না কাকুতি-মিনতি ছিল ভিতরে ভিতরে ! বাইরে তার প্রকাশ ছিলনা কোনো। তাহলেই যদি এক কমে যায় ? তখন তো এক্কেবারে আমি 'এ-কম', তাই না ! আর তাছাড়াও, ভিতরে জমে জমে শূন্যগুলোর এক হওয়ার চেষ্টা প্রকাশ করতে নেই যে ! তাহলেই শুরু হবে সব পিছিয়ে পড়াগুলোর গুজগুজ, "এই এই, জ্যানিস, ও না এক হতে চায় ! হতে চায় অদ্বিতীয় !" বুঝবে না তখন কেউ 'আসলে আমি হতে চাই' একা ! একাই তো উপরের ওইটুকুন পথ বেয়ে বেয়ে উঠে পড়তে হয়, তাই না মা ! সবার চোখের আড়াল দিয়ে গিয়ে, খানাখন্দ খুঁজে, সকলের নজর এড়িয়ে !

তুমি অবশ্য ওই "এক এক্কে এক" এর নামতা কোনোদিন শেখাওনি। শিখিয়েছিলে "দুই দু গুণে চার, তিন তিনেক্কে নয়"– হিহি! "তিনেক্কে"! মনে আছে, আমি "তিরিক্কে" শুনতাম খালি আর তুমি হাসতে! কেবল হাসতে। কই, কোনোদিন তো তবু আমায় শুধরে দাওনি একবারও! "তিরিক্ষে" মেজাজও দেখাওনি! এই কিন্তু তোমাদের দোষ, বুঝলে। অবশ্য মায়েদের শুনেছি ভুল ধরতে নেই একবারও ! দেখলে তো, সেই কেমন আবার এলো এক !

তা যা হোক, এক্কেবারে পয়লাই হতে চেয়েছি কিন্তু বরাবর ! ওই, যখন হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে ডাক্তার তোমায় বলেছিল, "হেলদি বেবি" – তখন থেকে সব এদিক ওদিক পড়ে থাকা খ্যাংড়াকাঠিদের ডিঙিয়ে আমি কিন্তু শুরু করে দিয়েছি দৌড় ! একদম একা ! আসলে, এমন প্রতিযোগিতার যুগ না এখন, সবকিছু আগে থেকে শিখে দেখে না আসলে মুশকিল! ফস করে যদি তখন সব ফসকে যায় ?

কি ফস্কাবে ? কি আবার ! "একমেভ অদ্বিতীয়ম" ! উহুঁ, ওই মন্ত্র শুনে শুনেই তো আমি আর জন্মায়নি, জন্মেছে আমার মতো দেখতে অথচ আমি নই গোছের একটা পরজীবী। বাঁচতে গেলে যারও ক্লোরোফিল লাগে – তবু লতার শক্ত মোচড় দিয়েই তাকেও আদায় করে নিতে হয় আহার ! উঁহু, এই মাগ্গির বাজারে সস্তায় একটা 'এক' ও বুঝলে, কেউ দেয় না !

তবু সব চাওয়ার কি আর কোনো হিসেব মেলে নাকি ! গুটি ফেলে যেতে হয় তবুও একের পর এক ! দেখলে মা, আবার কেমন 'এক' পড়ল সেই ?

ধুর, ভাল্লাগে না !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

তপনজ্যোতি মিত্র

সুধাসাগর তীরে

অনেকদিন আগের কথা।

ছোট মেয়েটি সিংহদরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

শীর্ণ শরীর, ক্ষুধা কাতর মুখশ্রী, ছিন্ন পোশাক।

তাকে কেউ ভেতরে ডাকেনি।

কতলোক যাতায়াত করছে সেই বিশাল বাড়ির দরজা দিয়ে।

মেয়েটি একটিবার প্রতিমাকে দেখতে চায়, শুধু একটিবার চোখের দেখা, কিন্তু ভয়ে সে ভেতরে যায় না।

দরজার সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

গাড়ি থেকে নামেন এক অসামান্যা সুন্দরী মহিলা, সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে, তারই বয়সী।

সেই মহিলাটি বাড়ির ভেতর ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ চোখ গেল এই গরীব মেয়েটির দিকে।

মেয়েটিকে তিনি ডাকলেন কাছে – এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে, কী নাম তোর, কি চাস তুই ?

মেয়েটি ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এই ভদ্রমহিলার সামনে সে কুঁকড়ে যায়, এনাকে সে চেনে না।

তারপর কান্না ভেজা গলায় বলে – আমি সুধা, একটু ঠাকুর দেখতে দেবে গো ?

সেই মহিলার হৃদয় আর্দ্র হয়ে যায়, মেয়েটির হাত ধরে ডাকেন – আমার সাথে আয়, তোর মা বাবা ভাই বোন সব কোথায় ?

মেয়েটি মাথা নিচু করে বলে – মা মারা গেছে, ভাইবোন নেই।

বাবা কোথায় তোর ?

এ বাড়িতেই তো কাজে গেছে বাবা।

সেকি রে, তাহলে তুই যাসনি ভেতরে ?

না, বাবা বারণ করলো, বললো – বাইরে দাঁড়িয়ে থাক।

তোর চোখমুখ তো খুব শুকনো দেখাচ্ছে, কিছু খাসনি ?

না মণিমা, বাবা বলেছিল কোনও এক সময় খাবার দিয়ে যাবে।

মণিমা ডাক শুনে সেই মহিলার চোখে জল ভরে যায় ।

সেই সময় গোবিন্দ বাইরে আসে মেয়েকে একবার দেখতে।

আর এসে ঘাবড়ে যায় মেয়ের সঙ্গে মহিলাটিকে দেখে, এই মহিলা তো এই বাড়ির বড় মেয়ে অনুপমা।

হাত জোড় করে বলে – আমার মেয়ে কি কোনও দোষ করেছে, দিদিভাই ?

অনুপমা কপট রাগ দেখিয়ে বলেন – গোবিন্দ, তুমি তোমার মেয়েকে না খাইয়ে বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ?

গোবিন্দ ভয় পেয়ে যায়, বলে – ভেতরে তো পূজার বিরাট ব্যাপার, সেখানে আমার এই ছোট মেয়ে কি করতে কি করে ফেলবে ।

অনুপমা বলেন – আমি তোমার মেয়েকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি, ও ঠাকুর দেখতে চেয়েছে, ও স্নান করে পরিষ্কার হয়ে মণ্ডপের সামনে বসে পুজো দেখবে ।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যায় গোবিন্দ, করজোড়ে বলে – তাই হবে দিদিভাই ।

স্নান করে পরিষ্কার হয়ে সুধা বসে থাকে পূজামণ্ডপের সামনে, সে আকুল আকুতিতে দেখতে থাকে অপূর্ব সুন্দর সেই দেবীমূর্তি । দেখতে দেখতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না ।

কার ডাকে যেন ঘুম আধা ভাঙে ।

আধা ঘুমের মধ্যে সে যেন দেখে তাকে দেবীমা স্নেহভরে ডাকছেন, বলছেন – অনেক দিন তো কিছু খাসনি, এখন কিছু খেয়ে নে সোনা ।

দেবীমা তাকে খাইয়ে দিচ্ছেন ভাবতেই সে ঘুম ভেঙে পুরো জেগে উঠল, দেখল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন অনুপমা, বলছেন – আহা রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিস, খাবি আয় । আর এই হল ইন্দ্রাণী, আমার মেয়ে, তুই এখন থেকে ওর সঙ্গে থাকবি ।

অনুপমা গোবিন্দকে ডাকলেন – গোবিন্দ তোমার মেয়ের ভার আমি নিলাম, সুধা এখন থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে, ও ইন্দ্রাণীর খেলার সাথী হবে । সুধার পড়াশুনোর দায়িত্বও আমি নিলাম ।

কখনো কি শুকিয়ে যাওয়া নদীতে গভীর প্লাবন আসে, কখনো কি মরুভূমির উষ্ণ বালুরাশির ওপর ঝরে পড়ে অনন্ত বৃষ্টিকণা? কখনো কি এই পৃথিবী বিশ্বাসের আদিগন্ত আশ্রয়স্থল হয়ে যায় ?

ভালোবাসার কি এই দিগন্ত চরাচর ? সেখানে নদীর ধারে কাশফুলের ভেতরে যেন দুটি অমল বালিকা হাতে হাত ধরে হাঁটছিল, আর তাদের জন্যে যেন অপেক্ষা করে থাকছিল দিগন্তবিস্তৃত সেই পৃথিবী ।

মা মরা মেয়েটির চোখ থেকে কখন যেন নেমেছে অজস্র অশ্রুকণা, ইন্দ্রাণী ডাকল – কাঁদিস কেন রে সুধা, বলতে বলতে সেও কি কাঁদছিল, অনুপমার চোখেও কি জল, গোবিন্দর চোখেও ?

অনুপমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ওনার স্বামী দেবর্ষি, তাঁর প্রশান্ত দেবপ্রতিম মুখে একটি স্নেহের জগৎ খেলা করছিল । আর তখনি যেন মণ্ডপে অধিষ্ঠিতা দেবীমার উজ্জ্বল চোখদুটি থেকে ঝরে পড়ছিল গভীর মমতার ভুবনজোড়া স্নেহ অশ্রুজল ।

কখন, কখন যেন সেই করুণাঘন পৃথিবী ধীরে ধীরে স্বর্গ হয়ে যাচ্ছিল ।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই.টি. । কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু’এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা ‘বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি’, ‘অমৃতের সন্তানসন্ততি’, ‘ঈশ্বরকে স্পর্শ’, ‘মায়াবী পৃথিবীর কবিতা’, ‘একটি কান্নার কাহিনী’ । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ ।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

উলুখাগড়ার দিনলিপি – জব্বলপুর - দিল্লি - জব্বলপুর

পর্ব ২

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাৎই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ দ্বিতীয় পর্ব।

ট্রেনের দুলুনিতে আর ক্লান্তিতে একসময় হার মানলো চিন্তা-ভাবনা। ট্রেনের কামরায় জব্বলপুর যাবার আরো লোক ছিল। রামধারীর সাথে গল্প করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন জব্বলপুরে নেমে দেখলাম আমাদের নিয়ে যেতে মিলিটারীর লোক এসেছে, সাথে তাদের গাড়ী। আমাদের কাগজ পত্র দেখে আমাদের গাড়িতে তুলে নিলো। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমরা এসে পৌঁছলাম, ১ MTR (Military Training Regiment)। ২ নম্বর MTR ছিল গোয়াতে। পৌঁছনোর পরই আমাদের সকলকে হিন্দিতে অনেক কিছু ভাষণ দেওয়া হলো, যার বিন্দু বিসর্গ আমি কিছু বুঝলাম না। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলম। তখন হিন্দি একেবারেই বুঝতাম না। পরে রামধারী সেই ভাষণের প্রায় পুরোটাই ব্যাখ্যা করেছিল। তারপর থেকে রামধারী কিছুদিনের জন্য আমার হিন্দি মাস্টার হয়ে গেল। নইলে বেশ অসুবিধাই হত।

আমি এবং রামধারী A Company তে নয় নম্বর সেকশনে পোস্টিং হলাম। আমাদের সাথে আরো আটতিরিশ জন ছেলে ছিল। চল্লিশ জন মিলে A-৯ সেকশন তৈরী হল। এবং সেকশনের দায়িত্ব নিলেন, নায়েক এইচ. জি. পাঠক, হরগোবিন্দ পাঠক। বিহারের মানুষ। প্রতিদিন ওই চল্লিশ জনকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন স্টোরে যেতেন। কম্বল, মশারি, মগ, জামা-প্যান্ট আরো নানান দৈনন্দিন জিনিসপত্র সকলকে ভাগ করে দেওয়া হত। নানান জিনিস রাখা থাকত আর আমাদেরই এক একজনকে বলা হত এই জিনিসটা একেকটা করে সকলকে দিয়ে দাও। সেরকমই একদিন আমায় বলা হলো, "এই বাঙালিবাবু, সব কো এক এক ধাগা বাঁট দো।" 'ধাগা' মানেই জানতাম না তখন। ভাগ্যিস আমার মুশকিল আসান হিন্দি মাস্টার রামধারীলাল ছিল। সাথে সাথে বললো, একটা করে সুতোর রিল সকলকে দিয়ে দাও। অনেকদিন কলকাতায় থাকার কারণে রামধারী বাংলাও ভালো জানতো। এরকমই তখন ছিল আমার হিন্দি জ্ঞান। কয়েকদিনের মধ্যে আরো এক বাঙালির সাথে আলাপ হলো। আর এক চ্যাটার্জি। ওরা আগ্রার বাঙালি। বাংলা বলতো কিন্তু লিখতে পারতো না। খুব কষ্ট করে বাংলা পড়তো। বাড়িতে চিঠি লেখা সেও হিন্দিতে। A-৯ সেকশনে আমরা এই দুজনই বাঙালি ছিলাম। পুরো A-company তে অবশ্য আরো অনেক বাঙালি ছিল। আস্তে আস্তে সকলের সাথে আলাপ হতে লাগলো। বাবা-মায়ের জন্য মন খারাপটা যদিও লেগেই থাকলো। খাম পোস্টকার্ড এনে সকলকে চিঠি দিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই MTR এর ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। শুনলাম এখানে ছয়-সাত মাস ট্রেনিং হবে। ড্রিল, পিটি এবং রাইফেলের সব ট্রেনিংই থাকবে। সকালবেলা প্রথমে পি.টি (Physical Training) হতো। তারপর সকালে জলখাবার। তারপর ড্রিল বা প্যারেড এর ট্রেনিং হতো। তারপর রাইফেল ট্রেনিং। বেলা একটা পর্যন্ত এইসব ট্রেনিং চলত। তারপর দুপুরের খাওয়ার বিশ্রাম। বেলা চারটে পর্যন্ত ছুটি। চারটের পর কখনো খেলা কখনো অন্য কোনো কাজ। অন্য কাজ বলতে-

গ্রাউন্ড পরিষ্কার, ঘাস কাটা বা বাগানে গিয়ে গাছে জল দেওয়া। সন্ধ্যায় স্নান করে রোল কলে যেতে হত। সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রোলকলে পরের দিনের সব অর্ডার পড়ে শোনানো হত। তারপর রাতের খাওয়া। এক একটা মেসে প্রায় চারশো-সাড়ে চারশো ছেলে খেতো। ফলে মেসে বিশাল লাইন পড়তো খাবার নেবার জন্য। খাবার পর আমরা কজন মিলে একটু বাইরে বেড়াতে যেতাম। আবার কেউ কেউ রিক্রিয়েশন রুমে গিয়ে কাগজ পড়া বা ক্যারাম খেলা এইসবও করতো। যা কিছুই করো না কেন, রাত দশটায় সকলকে বিছানায় থাকতে হবে। সেকশন লিডারকে 'এতজন নাইট ডিউটিতে বাকি সব বিছানায়' – এইরকম লিখে, সই করে প্রতিদিনই 'Light out' রিপোর্ট দিতে হতো। মোটামুটি এরকমই ছিল রোজনামচা MTR এর।

ইতিমধ্যে সেকশনের পাঁচ জনকে বিভিন্ন রকম পোষ্ট দেওয়া হয়েছিল। একজন রিক্রুট হাবিলদার, দ্বিতীয় জন রিক্রুট নায়েক আর বাকি তিন জন রিক্রুট L/নায়েক। সকলের কাজ ভাগ করা ছিল। আমাদের যে সেকশন কম্যান্ডার ছিলেন নায়েক H. G. Pathak, উনি আমাকে রিক্রুট হাবিলদার নিয়োগ করেছিলেন। প্রচুর দ্বায়িত্ব ছিল আমার। পুরো সেকশনকে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। দুপুরে সকলে মেসে খেতে চলে যেত। আমাকে খাতা কলম নিয়ে দুপুর ও বিকালের অর্ডার আনতে হত। একটা অবশ্য সুবিধে ছিল, কেউ না কেউ আমার খাবারটা মেস থেকে ব্যারাকে নিয়ে যেত। আমার খেতে দেরি হত। খাওয়ার পর সকলকে অর্ডার জানিয়ে দিতাম। যেহেতু আমি সেকশনের লিডার ছিলাম আমার কোন নাইট ডিউটি পড়ত না। বৈকালে কোন ওয়ার্কিং-এ যেতে হত না। তবে সেকশনে কোন গন্ডগোল হলে আমাকেই প্রথম ধরা হত। প্রথম গালাগালি আমিই খেতাম, তারপর যে দোষ করেছে – সে। আমাদের সেকশনে চেট্টিয়ার বলে একজন মাড়োয়ারি ছেলে ছিল। সে সব থেকে ভাল ড্রিল করত। পাঠক তাকে নাম ধরে ডাকত না – 'মেরে লাল' – বলে ডাকত। আমাকে 'বাঙ্গালিবাবু' বলত। ছুটির দিন বা রবিবারে – সকলকে, মন্দির, গির্জা বা মসজিদে যেতে হত। আমরা মন্দিরে, বাকি সব যে যার ধর্ম অনুসারে মসজিদে বা গির্জায় যেত। প্রথম মন্দির যাওয়াটা বেশ মনে আছে। পাঠক সকালে বললে, সকলকে মন্দিরে যেতে হবে। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় আমি একটা ধুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু মন্দিরে যাব, আমি সেইদিন ধুতি পরে তৈরী হয়ে বেরিয়ে এলাম। ওই অবস্থায় আমায় দেখে পাঠক বললে, "এই বাঙালিবাবু, এখানে ধুতি চলবে না। ধুতি খুলে প্যান্ট পরে এসো।" মিলিটারি চাকরিতে পরে আমি একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেজিমেন্টে ছয় বছর ডেপুটেশনে ছিলাম। ওখানে থাকাকালীনই ১৯৬৫র ভারত-পাক যুদ্ধ হয়েছিল। ওখানে কিন্তু দেখেছি, ছুটির দিনে ওরা অনেকেই ধুতি পরে ঘুরে বেড়াতো। কাছা দিত না অবশ্য। লুঙ্গির মত পরতো। যাই হোক, হুকুম যখন হলো ধুতি খুলে আসার, সেখানে কোনো তর্ক চলবেনা। ধুতি খুলে প্যান্ট পরে মন্দিরে গেলাম ঐদিন। ছুটির দিনে জব্বলপুর শহরে বেড়াতে যেতাম। ওখানে সাইকেল ভাড়ায় পাওয়া যেত। বেশ কয়েকবার ওখান থেকে সাইকেলে ভেরাঘাটে মার্বেল রক দেখতে গিয়েছি।

বেসিক ট্রেনিংটা বেশ কষ্টের ছিল। মনে মনে ভাবতাম কবে শেষ হবে। ইতিমধ্যে রাইফেল চালানো শিখে গেছি। রেঞ্জে গিয়ে ফায়ারিং করেও এসেছি। ট্রেনিং এর সময় ৩০৩ রাইফেল ব্যবহার করতাম আমরা। পরে ৭.৬২ রাইফেল। LMG (Light Machine Gun), স্টেনগান আর পিস্তল ফায়ারিং শিখতে হয়েছিল। পিস্তল ফায়ারিং এ সবচেয়ে ঝামেলা বেশি। কারণ হাতটা নড়ে যায়। LMG বেশ সুবিধার ছিল। স্ট্যান্ডে রেখে ফায়ারিং করা যায়। কষ্ট হয় ট্রেনিংয়ে কিন্তু আবার মজাও লাগে বেশ। চিঠিতে নেদা ও দেবুকে এইসব কথা লিখতাম। বাবা-মাকে সব থেকে বেশি চিঠি লিখতাম। সব দাদা, দিদিদের আলাদা আলাদা চিঠি লিখতাম। MTR ট্রেনিং শেষ হলে ছুটি পাওয়া যাবে শুনেছি। দেখা যাক কি হয়। শেষ তো হোক আগে। যা মাইনা পেতাম তার থেকে কুড়ি-পঁচিশ টাকা হাতে রেখে বাকিটা বাবাকে পাঠিয়ে দিতাম। দেড়শো টাকা মতো মাইনা ছিল তখন। তাতেই আমার আনন্দ যে বাবাকে কিছু টাকা পাঠাচ্ছি। বাবাকে একশ কুড়ি পঁচিশ টাকা পাঠিয়ে মানি অর্ডার ফর্মে লিখে দিতাম, বাবা যেন মাকে পাঁচ টাকা দিয়ে দেয়। আমার তাতেই আনন্দ ছিল। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় বাবা মা যদি আজ থাকতেন, তাহলে অনেক বেশি টাকা বাবার হাতে দিতে পারতাম। কারন দুটো চাকরির পেনশন অনেকটাই পাই এখন। বাবা-মা থাকলে কত ভালো হতো। এমন ব্যস্ত ছিলাম টাকা পাঠানোর ব্যাপারে যে আমাদের পাঠক স্যার কে বলে রেখেছিলাম মাসের এক তারিখে যেন মানি অর্ডারটা হয়ে যায়। ওখানকার নিয়ম ছিল, যারা মানি অর্ডার

করবে, তার একটা লিস্ট করতে হবে। যত টাকার মানি অর্ডার এবং তার কমিশন সব ঠিক করে টাকা কালেকশন করে কোনো স্টাফকে দিতে হতো, সে পোস্ট অফিসে গিয়ে মানি অর্ডার করে আসতো আর সকলকে রশিদ দিয়ে দিত। আমার চেষ্টাটা বোধহয় সব থেকে বেশি ছিল। কারণ আমি শুনেছিলাম, বাবা মাসের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিদিনই পোস্ট অফিসে যেতেন টাকার খোঁজ নিতে, যদিও পোস্টঅফিস আমাদের বাড়ির খুব কাছে ছিল। এখন যেখানে আছে তার থেকেও আরো কাছে ছিল। ওই টাকা পেয়ে বাবার যে আনন্দ হতো সেটা অন্যের চিঠিতে জানতে পারতাম। বাবার আনন্দের কথা শুনে আমার মিলিটারি ট্রেনিং এর কষ্ট আর কষ্ট বলে মনে হতো না। এমনিই আনন্দ যে, বাবাকে একটু সাহায্য করতে পারছি। জব্বলপুর ট্রেনিং সেন্টারে ওপেন এয়ার সিনেমা দেখার জায়গা ছিল। বিভিন্ন সেকশন এর জন্য আলাদা আলাদা তারিখ থাকতো সিনেমা দেখার। মাথার ওপর ছাদ ছিল না। কোনো চেয়ার নেই। সিমেন্টের লম্বা বসার জায়গা। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষার সিনেমা আসতো। বাংলা সিনেমাও আসতো। আমরা যেতামও সিনেমা দেখতে। জব্বলপুর শহরে প্রায় প্রতি রবিবার বাংলা সিনেমা নিয়ে আসত 'ডিলাইট' বলে একটা সিনেমা হলে। জানি না নামটা ঠিক লিখলাম কিনা। অনেক দিন আগের ব্যাপার। এই ভাবেই কাটছিল সময়। এরই মধ্যে বিভিন্ন খেলার জন্য নাম চাওয়া হচ্ছিলো। আমার ইচ্ছে ছিল ফুটবলের জন্য নাম দেব, কিন্তু পাঠক স্যার নাম দিতে দিতেন না। ওঁনার কথা ছিল, যদি একবার সেন্ট্রাল টিমে চান্স পেয়ে যাই তাহলে ফাইনাল পাস আউট প্যারেডে যেতে দেবে না। বাবার প্রায় প্রতি চিঠিতে লেখা থাকতো কবে ছুটি পাওয়া যাবে। আমার সাথে ছেলেরা পাস আউট করে ছুটিতে বাড়ি যাবে, আর আমাদের, মানে যারা খেলার সঙ্গে আছে তারা ওখানেই পড়ে থাকবে। তাই ওঁনার কথা মেনে নিয়ে আর খেলার জন্য নাম দিইনি। দেখতে দেখতে সেই শুভ দিন এলো। আমাদের একটা একটা করে পরীক্ষা হতে থাকলো। পিটি ট্রেনিং, ফায়ারিং, বিভিন্ন আর্মসের পরীক্ষা, ম্যাপ রিডিং এবং সবশেষে ড্রিল। অন্য পরীক্ষায় সেরকম ভয় নেই, কিন্তু ড্রিলের সামান্য ভুল হলে সব মাটি হয়ে যাবে। সকলেই খুব ভয়ে ছিলাম। ড্রিলে আমি, চেট্টিয়ার (যাকে পাঠক 'মেরে লাল' বলতো) আর শেখরন বলে একটা ছেলে গাইড হিসেবে থাকতাম। আমাদের একটু আলাদা ভয় ছিল। একটু ভুল করলে ধরা পড়ে যাব। পুরো স্কোয়াডটা রেলিগেট হয়ে যাবে। ভগবানের আশীর্বাদে ফাইনাল পরীক্ষা হলো আর আমরা সকলে পাস করে গেলাম। সেদিন কি আনন্দ সকলের। পাঠক স্যার আলাদা করে আমাকে আর চেট্টিয়ারকে পিঠ চাপড়ে দিলেন – "সাবাস বাঙালিবাবু, সাবাস মেরে লাল" বলে। পরেরদিন রোল কলে অর্ডার বের হলো আমাদের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। আপাতত এক মাসের ছুটি যাব। বাকি ছুটি পরে পাওয়া যাবে। তাতেই সকলের আনন্দ। এক মাসের ছুটি নিয়ে আমরা যে যার বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি আসার সময় আবার সেই রামধারীলাল আর আমি কলকাতায় ট্রেনে। চ্যাটার্জী তো আগ্রা গেল, তার বাড়ি। কলকাতা আসার আর কেউ বাঙালি নেই। ঠিক সময় বাড়ি পৌঁছালাম। সে কি আনন্দ। বাবা মা আনন্দে কত কথাই না বললেন। মা আলাদা করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ওখানে কত কষ্ট হচ্ছে তোর, ঠিকমত ওরা খেতে দেয় তো ? পেট ভরে কিনা ? আগের এক মাস, আর এক মাস ছুটির টাকা মোট দু মাসের টাকা পেয়েছিলাম একসাথে। কত টাকা সেটা আজ আর মনে নেই। সামান্য কিছু আমার কাছে রেখে সব টাকা বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। বাবা ধারে গরুর জন্য খড় কিনে এনেছিলেন শঙ্করদার (পাশের গ্রাম, রাইনে থাকতেন) কাছ থেকে। আমার কাছ থেকে টাকা পেয়ে সেইদিন বৈকালে হেঁটে গিয়ে শঙ্করদাকে টাকা দিয়ে এসেছিলেন। আমিও খুব আনন্দে কাটাচ্ছিলাম সেই ছুটির দিনগুলো। ওই এক মাসের ছুটিতে গ্রামের টিমে বাইরে গিয়ে খেলেও এসেছিলাম মনে আছে। খুব আনন্দে কাটছিল দিনগুলো। পনেরো কুড়ি দিন কিভাবে কেটে গেল বুঝতে পারিনি। এইবার মনটা খারাপ হতে থাকলো। ছুটি শেষ, আবার সেই ফৌজি জীবনে জব্বলপুরে ফিরে যেতে হবে। এক একটা দিন শেষ হলে মনে মনে দিন গুনতাম আর এতদিন আছে ছুটি শেষ হতে। বাবা-মার মনটাও খারাপ হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। আমাকে এবার ফিরে যেতে হবে বলে বাবা বিশেষ করে বেশি মন খারাপ করতেন। আমার ব্যাপারে মাঝে মাঝে বলতেন, "তোর জন্য কিছু করতে পারলাম না।" "আমি পয়সার অভাবে তোকে ভালো করে লেখাপড়া করাতে পারলাম না।" "কাউকে বলে একটা চাকরিও করে দিতে পারলাম না।" আমার থেকে বেশি কষ্ট বাবার হত বলে মনে হয় আমার। মায়ের কষ্ট হতো নিশ্চয়। মা কিন্তু একটু চাপা ছিল, বাইরে প্রকাশ হত না। প্রতিদিনই বৈকালে স্কুল গ্রাউন্ডে খেলতে যেতাম। খেলা শেষ হলে স্কুলে বসে বন্ধুরা গল্প করতাম। কিন্তু ঠিক আটটা পর্যন্ত। তখন জশাড়-আনন্দপুর একটা বাস চলত। সেই বাস

আটটায় আসতো। এলেই আমি আর গ্রাউন্ডে থাকতাম না। সোজা বাড়ি চলে আসতাম। কারণ, বাবা বসে থাকতেন আমার জন্য। আমি না এলে বাবা একা খাবেন না। খাবার কথা বললেই বলতেন এখন খিদে পাচ্ছে না। আমি আসার পর বাবা আর আমি একসঙ্গে খেতাম।

ইতিমধ্যে ছোড়দি B.A.-তে ভর্তি হয়েছে। তমলুক কলেজে পড়ে। মেজ দিদির বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছে। থাকা খাওয়ার খরচ লাগত না, কিন্তু কলেজের অন্যান্য খরচ কে দিত জানি না। এখানে থেকে B.A. – পাস করেছিল এবং পরে প্রাইভেট – G.M.A. পরীক্ষা দিয়েছিল। দেখতে দেখতে জব্বলপুর ফিরে যাবার দিনটা এলো। জব্বলপুর থেকে ট্রেনের আসা এবং যাওয়ার টিকিট দিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের ভাড়া লাগবে না। খুব মন খারাপ করছে। আমাদের গ্রামের কুমোর পাড়ার নিমাইদা'র রিকশায় আমি আর নেদা উঠে বসলাম। রিক্সায় উঠে নিমাইদাকে বললাম তাড়াতাড়ি রিক্সা ছেড়ে দিতে, ওখানে যতক্ষণ থাকবো ততো বেশি মন খারাপ হবে। আবার সেই বোম্বে মেল, এলাহাবাদ। সময়টা বোধহয় রাত আটটা। স্টেশনে দেবু আর সব দাদারা এসেছিল। সকলেই কিছু না কিছু খাবার এনে ছিল মনে আছে। এত খাবার এসেছিল যে জব্বলপুর পৌঁছানো পর্যন্ত কোন খাবার আমাকে কিনতে হয়নি, শুধু চা খেয়েছিলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল – সকলকে হাত নেড়ে মিলিটারি কম্পার্টমেন্টের ভিতরে চলে গেলাম। ইতিমধ্যে রামধারী এসে গেছে। নেদা অত রাত্রে কি করে ফিরল কে জানে। এরপরও যতবার যাওয়া-আসা করেছি নেদা প্রতিবারই হাওড়া স্টেশনে গেছে। রামধারীর সাথে খাবার বিনিময় করে রাত্রের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম আর আসে না। নানা চিন্তা, বাবা মার মুখটা বারবার মনে পড়তে লাগলো। একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে, বাবা সকালবেলা একটা মাখা সন্দেশ এর প্যাকেট আর একটা নতুন গামছা আমাকে দিয়েছিলেন। পরে প্রতি ছুটি কাটিয়ে আসার সময়, প্রতিবারই একটা নতুন গামছা আর একটা মিষ্টির প্যাকেট দিতেন। নানা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে টিফিন করলাম, খাবার কিনতে হল না। ব্যাগে প্রচুর খাবার। সঙ্গে একটা সিনেমা জগৎ বা উল্টো রথ নিয়ে গেছিলাম, ওই বই পড়ে সময়টা কেটে গেল। সকলের সাথে গল্পও হচ্ছে মাঝে মাঝে। পরে দুপুরের খাবার খেলাম, এখনো কিছু কিনতে হলো না। জব্বলপুর পৌঁছানো পর্যন্ত খাবার শেষ হবে কি না কে জানে। দেখতে দেখতে জব্বলপুর পৌঁছালাম। মিলিটারির গাড়ি ছিল স্টেশনে, আমরা ওই গাড়িতে MTR পৌঁছে গেলাম। যারা ছুটি নিয়েছিল সকলেই প্রায় পৌঁছে গেছে ইউনিটে। আমাদের জন্য খাবার রাখা ছিল, রাত্রের খাবার – ডাল, রুটি ও তরকারি। সকালে আমাদের পিটি বা প্যারেড করতে হলো না। আলাদা ফল ইন করে অন্য কিছু কাজ করালো। রামধারী ও চ্যাটার্জি আমার সাথে আর থাকবে না, ওদের ওয়ারলেস অপারেটর ট্রেড, আমার জগ মানে রেডিও মেকানিক ট্রেড। এতদিন একসাথে আমরা বেসিক ট্রেনিং করছিলাম, এখন শেষ। এবার আমাদের সকলকে TTR (Technical Training Regiment)-এ পোস্টিং করবে। ওখানে সকলের টেকনিক্যাল ট্রেনিং হবে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সেকশন। আবার নতুন বন্ধু হবে। তিন চার দিনের মধ্যে আমাদের সকলকে TTR-এ পোস্টিং করে দিল। আবার নতুন জায়গা। এখানে পিটি প্যারেডের এত জোর নেই। টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর ওখানে পৌঁছে জানতে পারলাম TTR-এর জায়গা নেই, আমাদের সম্ভবত অন্য কোন বড় শহরের টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে পাঠাবে। ওখানে আমাদের ওয়ারলেস রেডিও কমিউনিকেশন এর বেসিক থিওরি পড়াবে। সত্যি সত্যি আমাদের দিল্লি R. Communication zone-এ পোস্টিং করা হলো আর আমাদের পড়াশোনা হবে দিল্লি পুসা ইনস্টিটিউটে। R. Com থেকে খাকি হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো না হলে সিগন্যালের গেঞ্জি পড়ে আমরা পুসা ইন্সটিটিউটে যেতাম। মিলিটারির একজন পার্মানেন্ট স্টাফ ওই ড্রেস, মানে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় আমাদের রাস্তার উপর দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে যেত। আমাদের খুব লজ্জা লাগত, রাজধানীতে ওই ড্রেসে হেঁটে যেতে। একটা গাড়িতে পৌঁছে দিলে ভালো হোত, কিন্তু কে আর আমাদের কথা শুনবে। R. Com zone-টা প্যাটেল নগর আর করোল বাগ এর মাঝামাঝি জায়গায়। ওখানে আমরা থাকতাম, সকালে টিফিন করে পুসা-তে চলে যেতাম, আবার পড়াশোনা করে দুপুর দেড়টায় R. Com ফিরে আসতাম। পুষাতে আমাদের নরুলা বলে একজন সিভিলিয়ান ইনস্ট্রাক্টর পড়াতেন। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম, আবার বৈকালে খেলাধুলা হতো। যে যার পছন্দ মত খেলাতে চলে যেত। ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল খেলা হতো। আমি ফুটবলে চলে

যেতাম। ফুটবলে ক্যাপ্টেন ভাটিয়া বলে একজন অফিসার ছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে ভাটিয়া সাহেবের কাছে আমার গুরুত্ব বেড়ে গেল। ফুটবলটা একটু ভাল খেলতাম বলে আমাকে বেশ ভালবাসতেন। বাইরের টিমের সাথে মাঝে মাঝে আমাদের ম্যাচ হত। আমি ওখানকার ফুটবল টিমে স্থায়ী সদস্য হয়ে গেলাম। যে কোন ম্যাচে আমি থাকতাম। ভাটিয়া সাহেবের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। রাতে সকালের পড়াশোনা নিয়ে ব্যাস্ত থাকতাম। বিশেষ করে আমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল, কারণ আমি কমার্সের ছাত্র ছিলাম এবং খুব সাধারন ছাত্র ছিলাম। ওখানে যেসব প্রশ্ন করা হোত সেসব আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। অন্য কোনো ভালো ছেলে, মানে পড়াশোনায় ভালো ছেলের কাছ থেকে বুঝতে হত। ছুটির দিন দলবেঁধে আমরা দিল্লি ঘুরতে যেতাম। একই জায়গা বারবার যেতাম। প্রতি ছুটির দিনে আউট পাস নিয়ে চলে যেতাম, সকালে টিফিন খেয়ে বেরিয়ে যেতাম আর দুপুরের খাবার বাইরে খেতাম। ওই সময় দিল্লির প্রায় সব জায়গা ভালোভাবে ঘুরেছি। একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। R. Com zone-এ আমাদের সেকশনে ৮/৯ জন বাঙালি ছিল। আমরা একটা ছুটির দিনে কুতুবমিনার বেড়াতে গেছি, যদিও এর আগে বেশ কয়েকবার ওখানে গিয়েছিলাম। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, দেখলাম একদল মেয়ে সালোয়ার কামিজ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে পোশাক সাধারণভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় মেয়েরা পরত না। এখন যদিও ওই পোশাক সকলেই পরছে। বসে বসে আমাদের একটি ছেলে গবেষনা করে বার করলো যে-ওরা সকলে বাঙালি। বেশিরভাগ ছেলে বলল, ওরা বাঙ্গালী হতেই পারে না, বাঙ্গালীরা এরকম পোশাক পরে না। সঙ্গে সঙ্গে বাজি ধরা হয়ে গেল। একজন বলল, আমরা জোরে জোরে বাংলায় কথা বলতে বলতে ওদের পিছন পিছন যাব, যদি বাঙালি হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের দিকে তাকাবে। কারণ ১৯৬৩ সালে ওখানে বাংলায় কথা বললে অবশ্যই বোঝা যাবে। আমরা বাংলায় কথা বলতে বলতে ওদের পিছন পিছন গেলাম, বোঝা গেল ওরা বাঙালি। ওদের মধ্যে একজন সোজা বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, “আপনারা বাঙালি ?” পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। যে বাজি হেরেছে, তার পয়সার আমরা সকলে কি যেন খেয়েছিলাম।

আমি না হয় চাকরি না পেয়ে ওখানে গেছি। আমাদের সেকশনে একজন ছিল, সে বি.এস.সি পাশ করে কোথায় মাস্টারি করতো, সে কিভাবে যেন হুজুগে মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তার নামটা এখন আর মনে নেই, আমাদের ক্লাসের সব থেকে ভালো রেজাল্ট ওই করত। অংক বা ইলেকট্রনিক থিয়োরি বুঝতে ওর অসুবিধা হতো না। আমরা সকলেই ছেলেটির কাছে রাত্রিবেলা আলাদাভাবে পড়াশোনা করতাম। ও আমাদের প্রতিদিনের পড়াটা বুঝিয়ে দিতো। অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে হতো, তাও সামলাতে পারতাম না। মনে মনে ভাবতাম এখানে এসেও আবার পড়াশোনার পাল্লায় পড়লাম। বৈকালে প্রত্যেকদিন ফুটবল মাঠে যেতে হতো, ভাটিয়া সাহেবের অর্ডার ছিল – প্লেয়ারদের অন্য কোন কাজে যেন লাগানো না হয়। পড়াশোনা, ফুটবল খেলা আর ছুটির দিন দিল্লী ঘুরে বেড়ানো। এই ছিল রুটিন। ১৯৯৯ সালে উত্তর ভারত বেড়াতে গিয়ে সেই সময় দিল্লির জায়গাগুলো ঠিক চিনতে পারছিলাম না। এখন নাকি আরও পাল্টে গেছে। মোট পাঁচবার আমি দিল্লিতে পোস্টিং এ ছিলাম, তবুও ১৯৯৯ সালে ওখানে গিয়ে চিনতে পারিনি। ছয় সাত মাস কেটে গেল। ওখানে ট্রেনিং শেষে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে আমাদের আবার জব্বলপুর TTR-এ পাঠিয়ে দিল। এখানে এবার বিভিন্ন প্র্যাক্টিক্যাল হবে বড় বড় ট্রান্সমিটারের সাথে।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

শিলং-এ বাস্তব শেষের কবিতা

“আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত” ।। . . .

গানটা শুনতে শুনতে ইন্দ্রানী অনেকক্ষণ চোখ বুজে ছিল । আজ কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত লাগছে । মনটা ছটফট করছে । কান থেকে হেডফোনটা নামিয়ে গাড়ির কাঁচ নামিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাল । প্রকৃতিও কেমন শান্ত ধীর স্থির হয়ে রয়েছে। তাদেরও কি মন অবসন্ন । গাড়ি চলছে তার আপন বেগে । সারি সারি গাছ আর পাহাড়ী উপত্যকা ক্রমশ যেন পিছনের দিকে চলছে। দুজনেই এখন অ্যাডাল্ট, চাকরি বাকরি করে। মনকে রিফ্রেস করতে আজ তারা শিলং যাচ্ছে। ইন্দ্রানীর মনটা আজ কেমন যেন রবিঠাকুরে আচ্ছন্ন । একের পর এক কবিতা আর গান মনের অবচেতনে গেয়ে উঠছে ।

আসলে রবীন্দ্রনাথও শিলং-এ এসেছিলেন তিন-তিনবার (১৯১৯, ১৯২৩ ও ১৯২৭) । দ্বিতীয়বারের সঙ্গী ছিলেন রাণু । রাণুর বিয়ে হয় ১৯২৫-এ । ১৯২৭-এ শিলং-এ এসে রবি ঠাকুর রাণুকে লিখলেন, “রাণু, শিলঙে এসে পৌঁছেছি । কিন্তু এ আর এক শিলং ।” এসব ভাবতে ভাবতেই ইন্দ্রানীর মনটা কেমন আনমনা হয়ে গেল ।

কৃষ্ণেন্দু ইন্দ্রানীর দিকে তাকিয়ে দেখল, ইন্দ্রানী বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে । কৃষ্ণেন্দু জিজ্ঞেস করল কি হল রে, কার কথা এত ভাবছিস ? শিলং-এ যাচ্ছিস, রবিঠাকুরের কথা ভাবছিস না তো ? এতো ওনার প্রেমকাহিনী লেখার প্রেমনগর। দেখ ড্রাইভারকে আবার গল্পে গল্পে Inspire করিস না, তবে দেখবি ও হয়ত অমিত-লাবণ্যর মত গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেছে । চল, এবার গাড়ি থেকে নাম । সামনের ওই দোকান থেকে চা খাই । মনটা একটু ফ্রেশ হবে। মাঝে মাঝে আমার একটু চা পানের দরকার হয়ে পড়ে । না হয় একদিন তোকে চা পানের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে একটা সেসন দেব । আর তোর রবিঠাকুরের ওই অমিত রায় সে তো ফিরপোর দোকানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চা খেয়ে বেড়াত । ইন্দ্রানী সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করল তুই এসব জানলি কি করে ? কৃষ্ণেন্দুর চটপট উত্তর, একবার বন্ধুদের চাপে পড়ে তোদের রবিঠাকুরের একটা নভেল পড়েছিলাম, তবে তোর গুরুদেব রবিঠাকুরকে আমার মোটেও পছন্দ নয় । কিন্তু জানিস ওই নভেলের কাহিনীর সঙ্গে আমাদের প্রেম কাহিনীর অনেক মিল খুঁজে পাই। থাক ওসব কথা, ওই পাহাড়টাকে ব্যাকগ্রাউন্ড করে দাঁড়া, তোর একটা ছবি তুলি। তোর রবিঠাকুর এমন সময়ে হয়ত ছবি তুলতে তুলতেই আপনমনে কবিতার প্লট তৈরী করে নিত । যেভাবে অমিতের গলা দিয়ে লাবণ্যকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিল,

“সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে” ।

রবিঠাকুরের মত অত কষ্টকর শব্দ দিয়ে কবিতা আমার আবার আসে না । আমি হলে হয়ত লিখতাম,

“শাড়ীতে তোকে মানিয়েছে বেশ ভালো,
নজরকাড়া, মন মাতিয়ে দিলো
বয়স হয়েছে বোঝাই যায় না তোকে ।

তুই তো এখন অচিন দেশের পাখি
উড়ে এসে করিস ডাকাডাকি
চিনতে পারবি আমায় দূরের থেকে”?

চল এবার গাড়িতে ওঠ। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শিলং পৌঁছে যাব। ওখানে গেলেই পাবি পাহাড়, মেঘ, বৃষ্টি আর পাবি রডোডেন্ড্রন আর তোর গুরু রবীন্দ্রনাথ। তোদের সেই বুড়ো রবি ঠাকুর সে তো কবে মরে ভুত হয়ে গেছে। শুনেছি এখনো অমিত, লাবণ্য আর রানুর ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়। সেই ওদের প্রেমের প্রথম সাক্ষাতে নিবারণ চক্রবর্ত্তির কণ্ঠ দিয়ে কবিতা আওড়েছিল,

“পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।...
... উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ”।...

দেখ তোকে নিয়ে যদি আরও আগে এখানে আসতাম, যেভাবে রাণু এসেছিল রবিঠাকুরের কাছে। ১৯২৩-এ 'নির্জলা যৌবনের' অধিকারী ‘ছাব্বিশ’-এর রবীন্দ্রনাথ (আনুমানিক বয়স ছিল ৬১বছর) অমিতের মতোই, শিলং-এর পথে পথে ঘুরছিল এক সপ্তদশী সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে। মেতেছিল গল্পে, কৌতুকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা দুজনকে অসমবয়সি মনে করলেও, কবির ভ্রমণসঙ্গিণীর কাছে তিনি ছিলেন 'সাতাশ' বছরের তরুণ! কবি ঠাট্টা করে বলতেন, ‘সাতাশ’কে লোকে ‘সাতাশি’ শুনবে, বরং ‘ছাব্বিশ’ ভাল! অনেকে বলেন, শিলং পাহাড়ে কবির সেই ভ্রমণসঙ্গিণীর নাম ছিল রাণু – রাণু অধিকারী। তবে, এটা হলফ করে বলা যায় না! কিন্তু মিল রয়েছে অনেক।

‘রবীন্দ্রনাথ রাণু ও শেষের কবিতা’য় এমন কিছু সাদৃশ্যে তুলে ধরা আছে যেখানে, রাণু ও লাবণ্য, দুজনেই রবি ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পোশাক-আসাকেরও মিল রয়েছে অনেক। শেষের কবিতা লেখার সময় কবি বলেছেন, লাবণ্য তাঁর খুব চেনা। দু’জনের বাবার একই পেশা। লাবণ্যর বাবা অবিনাশ দত্ত এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ, রাণুর বাবা ফণিভূষণ অধিকারি ছিলেন দিল্লির হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ।

শোভনলালের সঙ্গে যেমন লাবণ্যর, তেমনি আট বছরের সম্পর্কর শেষে রাণুরও বিয়ে হয়ে যায় শিল্পপতি পুত্র বীরেন্দ্রর সঙ্গে। শেষের কবিতার সমাপ্তি যেমন, কেটির সঙ্গে অমিতের এবং লাবণ্যর সঙ্গে শোভনলালের আসন্ন বিয়ের খবর দিয়ে, তেমনি রাণু-রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যে জীবন-উপন্যাস, তারও সমাপ্তি রাণুর বিয়ের সম্ভাবনার সংবাদেই! যাই হোক আমি হলে লিখতাম,

তুই আর আমি এক কলেজেই পড়ি
আমার কমার্স, বাংলা অনার্স তোর
প্রায়ই কলেজ কেটে ভিক্টোরিয়ার ঘুরি
দুজনার কলেজ একই বিদ্যাসাগর।
কলেজটা ঠিক বড় রাস্তার পাশে
ক্লাসের ফাঁকে বসি গাছের তলায়
যদি লেট হয়, জ্যামে আটকে বাসে
ক্লান্ত হই তোর মিসড কলের ঠেলায়।

আমার বাড়ি সুদূর পটাশপুরে
মা-গঙ্গা বইছে উথাল-পাতাল স্রোতে
আজ পথ বেঁধেছি বন্ধনহীন সুরে
চলেছি মেঘের রাজ্য শিলং পর্বতে।

ইন্দ্রানী মুখ বেঁকিয়ে বলল, কি রে কবি হয়ে গেলি নাকি ? আমি জানি তুই রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করিস না। এ অসুখ তো তোর আগে কখনো ছিল না ।

একটা নভেল পড়ছি ম্যাডাম, নাম হল 'শেষের কবিতা', নাম শুনেছিস ?

না, শোনার ইচ্ছেও নেই ।

তবে শোন, তোর আর আমার প্রথম আলাপের দিনটা মনে পড়ে? তোর সেদিন কিসের এতো তাড়া ছিল জানি না। তুই হনহন করে কলেজের করিডোর দিয়ে আসছিলি আর আমি উল্টোদিক দিয়ে এসে তোকে পাশ কাটাতে যাব হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় তোর হাত থেকে পড়ে গেল মোবাইল, ডাইরি আর একটা বই।

Sorry! Extremely sorry! আমি তোর জিনিসগুলো কুড়াতে কুড়াতে, তোর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলাম।

তুইও লজ্জায় বলে উঠেছিলি, "I'm also sorry! দোষটা আমারই, এত জোরে আসা উচিত হয় নি, আসলে" ...

সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রত্যুত্তরে তোকে বলেছিলাম, 'It's okay' – আর জিনিসগুলো হাতে নিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলে গিয়েছিলি ইন্দ্রানী।

এবার তুই একটু মনে কর্ অমিত আর লাবণ্যর সেই কার অ্যাক্সিডেন্টের সিকোয়েন্সটা। দুর্ঘটনা হওয়ার পরে অমিত যখন পাওনা শাস্তির অপেক্ষায় লাবণ্যের কাছে এসে মৃদুস্বরে বলেছিল, "অপরাধ করেছি।"

লাবণ্যও হেসে হেসে উত্তর দিয়েছিল, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।"

এখন তোর উত্তর আর লাবণ্যর উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ ঠিক মিলে যাবে।

তারপর, তো তোর সঙ্গে আমার বারে বারেই দেখা হয়েছে, কখনও কলেজ করিডরের বাঁকে, ধোঁয়া ওঠা ক্যান্টিনের মুখের ফাঁকে ফাঁকে । আলাপ থেকে পরিচয় হয়েছে। গাঢ় হয়েছে ভালোবাসার রঙ। দিয়া জ্বলে উঠেছে হৃদয়ে। কখনও কবিতায় বলে উঠেছি

কতবার ভেবেছি 'ভালবাসি' কথাটা বলার
পিছিয়ে এসেছি লজ্জায়। সম্মানের ভয়ে।
স্বপ্নে, কল্পনায় সে দৃশ্য দেখেছি বারবার
তবু বলতে পারি নি। এক অদ্ভুত সংশয়ে।

তারপর একসঙ্গে পথ চলেছি কত, তিলোত্তমা কলকাতার কোণায় কোণায় হেঁটে দেখেছি, ট্রামে চড়ে দেখেছি, নৌকায় চড়ে দেখেছি। সাক্ষী আমাদের দুরন্ত যৌবন, সাক্ষী রয়েছে ভিক্টোরিয়ার মাঠ, সাক্ষী রয়েছে গঙ্গার বাতাস, সাক্ষী রয়েছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি । হাতে হাত রেখে তোকে চিনেছি, ঠোঁটের আদরে নিয়েছি শরীরের ঘ্রাণ, চিরে চিরে দেখিয়েছি ভালোবাসার মানে, লুকিয়ে সে কোথায় শরীরে না মনে ? ওগো কবিতা তুমি জেগে ওঠো কৃষ্ণেন্দুর কন্ঠে –

তুই মোহময়ী সুপার ডুপার রোলে
আমি বাদল দিন। ঝরা কদম ফুলে।
তুই পথের দিশা ওড়াস পরাগসুখ
আমি ছুটে মরি সামান্য বেতনভুক।

থাম্ থাম্ তোকে এত কাব্যি করতে হবে না। গাড়িটা দাঁড় করাবি প্লিস। ওই লাগেজে জিন-এর বোতলটা আছে, আমাকে দে একটু গলায় ঢেলে নি।

তোর কি হল রে ইন্দ্রানী ? এত চাপ খাচ্ছিস কেন ? Relax ইয়ার । বেড়াতে এসে মুখটা ভেটকে থাকিস না । বরং আমাকেও একটু প্রসাদ দিস।

– তুই নেশায় মাতাল হোস দু-এক পেগে
দেবী প্রসাদ দেবে ? নয়তো মায়ের ভোগে।
কেন সাজিস সতী ? না হয় হ'লি উদার
ঢাল বিষের জ্বালা। কেন ছলের বাহার?
খাই তোর'ই বিষ প্রাণের আশা ছেড়ে
জীবন সঁপেছি তোকে। তবু যাস অভিসারে।
কেন আঘাত হানিস? খেলার ছলে ভাসাস ?
দেখি খেলিয়ে আমায় কত সাহস নাচাস ?

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। কৃষ্ণেন্দু এবার রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা বইটা খুললো । ইন্দ্রানীকে বললো, শোন এই জায়গাটা, তোর ভালো লাগবে – ... "একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। ... মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ"। ...

ইন্দ্রানী বলল – ধুর গাড়ির শব্দে সব ঠিকঠাক বুঝতেই তো পারছি না। বইটা বন্ধ করে দেয় কৃষ্ণেন্দু । পেছনে ফিরে তাকায়, দেখে, ফেলে যাওয়া রাস্তা আর ফেলে আসা অতীত ।

গাড়ি ছুটে চলে নিজের গতিতে । ইন্দ্রানী আবার একটু জিন গলায় ঢেলে বোতলটা কৃষ্ণেন্দুর দিকে বাড়িয়ে বলে, নিবি ?

না থাক ।

ইন্দ্রানী ?

হুঁ !

তোকে কেমন যেন upset লাগছে। তুই কিন্ত আগের মত আর respond করছিস না ।

অন্যমনস্ক ইন্দ্রানী বলল – কিসে ?

যখন তোকে আদর করি । তোর sensasion excitement টা কি মরে গেছে, আমার প্রতি ? তোর কৃষ্ণেন্দুর ভাষায়,

ফুলের প্রয়োজন নেই। মন শুধু চায়
সাহসের। যা তোকে দেয় প্ররোচনা
আজ প্রেমের ক্ষুধা চাই এই অবেলায়
জীবন তো শিখিয়েছে শুধু যন্ত্রণা।

ইন্দ্রানী চুপ করে থাকলো, বলল – কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না ।

কৃষ্ণেন্দু বলল – জানিস, আমার মনে হচ্ছে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যে glimmer টা ছিল, সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

ভলকানোর লাভা কমে আসছে । তাই আমার কবিতা বলে,

হও বন্য পশুর মত হিংস্র, জ্বলুক আগুন
শরীরে শরীরে জাগুক চেতনা, বিপ্লব খুন।

লেখাটা কি তোর ভালো লেগেছে কৃষ্ণেন্দু ? ইন্দ্রানী জানতে চাইল ।

একটু থামলো কৃষ্ণেন্দু, বলল, লেখার ভাষা খুব back-dated লাগছে, obviously লাগবেই । Conversation ও খুব actual মনে হচ্ছে না, বড্ড আঁতলামো মনে হচ্ছে । তবে, লেখার মধ্যে কিছু তো একটা আছে বুঝলি । যেটা আমাকে খুব স্পর্শ করেছে । অমিত, যে গল্পের নায়ক, বাবার অগাধ পয়সা। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বি.এ পড়ার আগেই ওনার বাবা অক্সফোর্ডে ভর্তি করে দিলেন। প্রায় সাত বছর লাগল পাশ করে বেরিয়ে আসতে। বেশ বুদ্ধি আছে। তার বাবাও চাইতেন ছেলের গায়ে একটু অক্সফোর্ডের রঙ লাগুক। ভীষণ বকবক করে। বিষয় পেলেই হলো, সব কিছুতেই তার মতামত দেওয়া চাই। একটু নতুন স্টাইলে কবিতা লেখে। রবীন্দ্রনাথ ঘরাণা একদম পছন্দ করে না। আসলে সেই সময়ে, মানে ১৯২০-তে বা ওই পিরিয়ডে অনেক young writer রা রবীন্দ্রনাথকে ঠিক মেনে নিতে পারছিল না ।

তিনি তখন নোবেল জয়ী, কবিগুরু । কিছু নতুন লেখক তাঁর ছায়া থেকে বেরিয়ে নতুন স্টাইল আনতে চাইছিল । তারা বিদ্রোহী । সব জায়গাতেই কিছু বিদ্রোহী থাকবেই । তারাই তো সমাজ সাহিত্য এগিয়ে নিয়ে যায় । সেই কথা তিনি এই লেখায় দেখিয়েছেন । গল্পের নায়ক অমিত সেই বিদ্রোহী দলের নতুন মুখ বলতে পারিস । প্রায় সত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই সময়ের সাড়া জাগানো প্রেমের উপন্যাস । মানে, এই লেখাটা – শেষের কবিতা ।

গল্পটা কি ? একটু ছোট্ট করে বল ।

গল্প নয় রে ইন্দ্রানী, বল a great novel ।

আরে ওই হল, তা story line টা একটু বল দেখি ।

নভেলে অমিত একবার বলছে – রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়ার্ডসওয়ার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে –

ইন্দ্রানী বলল, তার মানে রবি ঠাকুর তার নিজের গল্পের ভেতরে ঢুকে গেছে ?

হুঁ তা বলতে পারিস । অনেকটা মহাভারতের মত, যে লেখক সেই গল্পে চরিত্র হয়ে ঢুকে পড়ছে ।

তা অমিত একবার একা একা শিলং পাহাড়ে বেড়াতে এলো । একবার পাহাড়ের বাঁকা পথে উপর থেকে নেমে আসা আরেকটা গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে জায়গা পেল না। ব্রেক কষতে গিয়ে ধাক্কা মারলো লাবণ্যর গাড়িতে । লাবণ্য হল নায়িকা । রবি ঠাকুরের কল্পনায় এক আলাদা জগতের মানুষ ।

এই, তোর মনে আছে, তোর আমার ধাক্কা ধাক্কি হয়েছিল কলেজের করিডরে ? তারপর তো আমাদের প্রেম জমে গেল । হা হা করে হেসে উঠল ইন্দ্রানী ।

ঠিক তাই, অমিত আর লাবণ্যর প্রেম ও হয়ে গেল এই প্রবল ধাক্কায়। তাদের প্রেমের সাক্ষী রইল শিলং পাহাড়, আকাশ বাতাস, বন । আর জানতো লাবণ্যর মাসিমা, যাকে লাবণ্য মায়ের মত ভালোবাসতো। তারা দুজনে প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল । লাবণ্যর কাছে এই প্রেম ঝড়ের মত, সমুদ্রের ঢেউ এর মত। সে নিজেকে আটকাতে পারে নি ।

কেমন মেয়ে এই লাবণ্য? – ইন্দ্রানী জানতে চাইল ।

স্নিগ্ধ, সুন্দর, শান্ত, পড়ন্ত বিকেলের আলোর মত, একটা বিরাট দিঘীর টলটলে জলের মত । চুপচাপ চেয়ে থাকতে হয় ।

তার মানে অমিতের উল্টো, তাইতো ?

হুঁ তাই ।

ইন্দ্রানী বলল – এ প্রেম তো টিকবে না ।

কৃষ্ণেন্দু অবাক হয়ে জানতে চাইলো – তুই কি করে বুঝলি ?

এরকম দুটো reverse personality একসঙ্গে থাকতে পারবে না রে ।

থাকেও নি । শেষ পর্যন্ত কেতকী বলে একটি মেয়ে এসে বলে যে অমিত তার সঙ্গে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে ।

Just a minute – ইন্দ্রানী বলে ওঠে – তুই সে জন্যই আমাকে এখানে নিয়ে এলি ? এই শিলং পাহাড়ে ?

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। তার হঠাৎ মনে হয় তাদের গাড়ি ছুটছে নাকি পাশের গাছ-পাহাড় ছুটছে ! তার অনেক কথাই বলার আছে । কিন্তু কি বলবে ইন্দ্রানীকে ?

কিরে কৃষ্ণেন্দু চুপ করে গেলি কেন ?

কৃষ্ণেন্দু বলল – কোথাও একটা যাওয়ার দরকার ছিল, শুধু তুই আর আমি । কলকাতা-আমাদের চাকরি-আমাদের পরিবার-একঘেয়ে সিনেমা দেখা এই cycle এ শুধু ঘুরেই যাচ্ছিলাম । আমাদের warm relationship এই cycle এ একটা part হয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রানী । আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছিস ইন্দ্রানী ?

ইন্দ্রানী অন্যমনস্ক হল । সেও বুঝতে পারছে কৃষ্ণেন্দু এর ব্যক্তিত্ব আর তাকে খুব একটা টানছে না । কিন্তু কেন ? একটা কারণ হতে পারে – সে নতুন দুজনের থেকে WhatsApp message পেয়েছে, তারা তার প্রেমে পাগল ।

সে কি এই relationship ভেঙে নতুন relation এ যাবে ? ঠিক বুঝতে পারে না । আর তাই একটুতে রেগে যায় । মুখ খারপ করে ।

সে বলল – ঠিক বুঝতে পারছি না কৃষ্ণেন্দু । মাঝে মাঝেই আমি তাই অস্থির হচ্ছি । তবু এক কথায় এখানে আসতে

রাজি হলাম । বাড়ির সবাই আমাদের relationship টা মেনে নিয়েছে, infact তারা বলে আমি খুব whimsical, তুই আমাকে নাকি ঠিকঠাক সামলাতে পারবি । আমার ও তো বুঝতে হবে আমাদের এই relation কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ।

কৃষ্ণেন্দুর কথা বলতে গলা কেঁপে যায়, তবু সে জিজ্ঞেস করে – তুই কি সম্পর্কটা শেষ করতে চাইছিস ?

কথাটা শেষ প্রশ্নের মত সজোরে ধাক্কা মারে, ইন্দ্রানী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বাইরে তাকিয়ে দেখে গাছের সবুজ পাতাগুলো সব লাল হয়ে যাচ্ছে । সে জানে না কেন, সে জানে না কি করে তা নিয়ন্ত্রন করতে হয় ।

ওয়ার্ডস লেক এসে গেছে । ড্রাইভার বলল – একটু ঘুরে ছবি তুলে নিন। এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। একটু পরই আমরা শিলং শহরে ঢুকবো । বোটিং ও করতে পারেন, খুব ভালো লাগবে ।

ইন্দ্রানী দেখলো লাল রঙ সরে গিয়ে আবার গাছে গাছে সবুজ ফিরে আসছে। লেকের জলের ভেতর নীল রঙ খেলা করছে ।

ড্রাইভার বলল – ম্যাডাম, ৩১০০ ফুট উঁচুতে এত বড় আর সুন্দর লেক কমই দেখা যায়। আসল নাম উমিয়াম লেক। উমিয়াম নদীর ওপর ড্যাম, তৈরি হয়েছিল ১৯৬০ সালে । খুব বড় লেক, ২২০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ।

স্পীডবোটে বসে ইন্দ্রানীর মাথা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হচ্ছে। জলের নরম হাওয়ায় ইন্দ্রানীর মনে হল, কতদিন কলকাতার বাইরে যাওয়া হয় নি। কলকাতায় যত মজা থাক না কেন মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়লে ভালোই লাগে। এখন যেমন লাগছে । কৃষ্ণেন্দুটা জোর না করলে আসাই হতো না । পাশে বসা কৃষ্ণেন্দুকে জড়িয়ে ধরতে গেল । গায়ে জড়ানো লাইফ জ্যাকেটে তারা মোটা হয়ে আছে । হেসে বলল – thank you কৃষ্ণেন্দু । স্পীডবোটের ড্রাইভারকে বলল – অর থোড়া জোরসে ।

লেক ঘুরে, প্রকৃতির ছবি তুলে, সেলফিতে মজে তারা ফিরে এল ।

কৃষ্ণেন্দু বলল, দেখ ইন্দ্রানী এরকম ওয়েদারেই তো অমিত এর গলা দিয়ে তোর রবিঠাকুর John Donne এর Canonization কবিতার প্রথম লাইন লাবণ্যের কানে তর্জমা করে বলেছিল,

For God's sake hold your tongue, and let me love
"দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্ ।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর ।"

আমি না হয় একই কবিতার সেই stanza-র'ই শেষ লাইনটা তোকে কানে কানে বলি

Contemplate; what you will, approve,
So you will let me love.
তোর অনুমোদন আর বিবেচনার অবসর
জানি তুই আমায় ভালোবাসবি অতঃপর

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বলল – শিলং হল মেঘালয়ের রাজধানী। ছবির মত সুন্দর শহর। দেখলেই ভালো লেগে যাবে । গড় উচ্চতা হল ৪৯০০ ফুট । তবে প্রায় দেড় লাখ মত লোকের বাস জানেন তো । এও সেই ইংরেজদের তৈরি করা । মেঘালয় রাজ্য তৈরি হওয়ার আগে শিলংই তো ছিল অসমের রাজধানী ।

ওয়াও মেঘ এসে গেল ! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ইন্দ্রানী ।

হ্যাঁ ম্যাডাম, এই হল মেঘের আলয়, তাই মেঘালয় । কখন যে মেঘ এসে বৃষ্টি বয়ে আনবে তার ঠিক নেই । জানেন তো এই মেঘালয় রাজ্যে একটা জায়গা আছে তার নাম মৌসিনরাম, শিলং থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে । যেখানে পৃথিবীর সবচাইতে বেশী বৃষ্টিপাত হয় । আপনারা চাইলে একদিন ঘুরিয়ে আনতে পারি ।

হোটেলটা বেশ ভালো । আগে থেকে বুক করা ছিল । সব কিছু প্রি-প্ল্যানড । তবু ? কৃষ্ণেন্দুর খটকা লাগল, ইন্দ্রানী এত কি কথা বলছিল হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে ? যদিও সন্দেহ করা তার ঠিক আসে না, তবু, ইন্দ্রানীর গায়ে পড়া আলাপ ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না । ম্যানেজার স্থানীয় ছেলে । বেশ সুপুরুষ দেখতে । রুমের ব্যালকনিতে দুজন বসে চা খাচ্ছিল ইন্দ্রানী, কৃষ্ণেন্দু । সামনে শিলং শহর আর বৃষ্টি ।

কি রে কৃষ্ণেন্দু এত চুপচাপ হয়ে গেলি কেন ? আমার কিন্তু জায়গাটা অসাধারণ লাগছে । রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে যে প্রেমের গল্প লিখবে এটা স্বাভাবিক । রবীন্দ্রনাথ নিজে খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন । কি রে কিছু বল ।

কৃষ্ণেন্দু হেসে বলল – তোর জায়গাটা ভালো লাগাছে ? বাপস্ যা মুখ গোমড়া করে ছিলি । আজ আর বেরোনো যাবে না । যা বৃষ্টি হচ্ছে । কাল সকাল সকাল ঘুরতে বের হব । শিলং এ কয়েকটা দেখার জায়গা আছে । আমার কিন্তু পুরোনো কথা খুব মনে পড়ছে । তোর আর আমার সেইসব দিন । দরজায় নক করলো কেউ । বৃষ্টি অনেকটাই ধরে এসেছে । ঠান্ডা শিরশিরানি মেঘ মেঘ আবহাওয়া শিলং জুড়ে ছড়িয়ে আছে । এরকম রোমান্টিক মুড অফ করতে কে এল রে বাবা ।

কৃষ্ণেন্দু দরজা খুলে দেখলো সুপুরুষ ম্যানেজার সামনে দাঁড়িয়ে । Sorry to disturb you sir, রাতের ডিনারে কি খাবেন যদি বলে দেন ।

– বাংলা তো ভালোই বল দেখছি । তুমি কি বাঙালি ?

– না স্যার, আমি শিলং এর ছেলে, এত বাঙালি ট্যুরিস্ট আসে বলে বাংলায় কথা বলা শিখে নিয়েছি । আপনারা কোলকাতা থেকে আসছেন ?

ইন্দ্রানী উঠে এসে বলল – একদম খাস কোলকাতার লোক ... ওদের আলাপ চলতে থাকলো, কৃষ্ণেন্দু এসে চেয়ারে বসে পড়ল । সামনে কুয়াশা বৃষ্টি কমে আসা আলো । তার ভালো লাগছে না ... একদম ভালো লাগছে না । এতদূরে ছুটে আসা কি বৃথা হয়ে যাবে ? যে ভালোবাসার খোঁজে এতদূর আসা, তা কি সফল হবে না ? সে কখনও সেভাবে ভগবানকে ডাকে নি । ভগবানকে ডাকলে কাজ হবে কিনা সে জানে না । তাকে কি পথ দেখাতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ ? অনেকদিন আগে সে একটা কবিতা লিখেছিল । তার আবৃত্তি করতে ইচ্ছে হল –

রবি ঠাকুর, তোমার কাছে ইচ্ছে করে যেতে

তোমার টোটকায় বুকের ব্যথায় শান্তি খুঁজে পেতে ।

চাকরি-বাকরি সবই আছে গার্লফ্রেন্ডরাও ঘোরে

তবু কষ্ট মনের কোণে জাপটে জড়িয়ে ধরে ।

কলেজ করিডোরের ধাক্কায় প্রেমের ফাঁদে পড়ি

পড়াশুনায় মন বসে না টো টো করে ঘুরি ।

কি পেয়েছি তার হিসাব মিলাতে ভাবি প্রতিদিন

ইন্দ্রানী হৈ হৈ করে ঢুকে এল – চল চল চার্চটা দেখে আসি ... কৃষ্ণেন্দুর মাথায় শেষ লাইনটা এল – কেমন হবে যদি আমি, হই চরিত্রহীন ?

এখন ?

হ্যাঁ চল না । সঙ্গে তো গাড়ি আছে না কি ?

তুই রেডি হয়ে নে, আমি একটু ওয়াশরুম হয়ে আসছি ।

কৃষ্ণেন্দু নেমে এসে দেখলো ইন্দ্রানী ম্যানেজারের সঙ্গে গল্পে মশগুল ।

কৃষ্ণেন্দু ভ্রু কুঁচকালো ।

ম্যানেজারের দিকে আর একটু বেশি ঝুঁকে হেসে কথা বলল ইন্দ্রানী ।

পরের দিন এলিফ্যান্ট ফলস্ । রাজু বলল – ফলস্ টা খুব সুন্দর ম্যাডাম, তবে অনেকটা নিচে নামতে হবে। একটু দেখে যাবেন। ইন্দ্রানী বলল – তুমি চল রাজু ।

রাজু বলল – না না আপনারা যান ।

কৃষ্ণেন্দুর একেবারেই যাওয়ার ইচ্ছে নেই। গাড়িতে বসেই বলল – যাও, তোমরা ঘুরে এসো ।

সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে ধোঁয়া ছাড়লো কৃষ্ণেন্দু ।

আজ কৃষ্ণেন্দুর খুব মনে পড়ছে সংযুক্তার কথা। আসলে সে তো ভালোবেসেছিল দুটো সত্ত্বাকেই। কি আর করে কৃষ্ণেন্দু, যে রবিঠাকুর কে সে একদমই পছন্দ করত না আজ তাঁরই ভাষায় তাকে বলতে হচ্ছে, “যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।” অর্থাৎ এতদিন সে ডানা মেলে উড়েছে ইন্দ্রানীর সঙ্গে, আজ সে ক্লান্ত। আজ সে ঘর বাঁধতে চায়। ডানা সে গুটিয়ে রেখেছে। আজ তার ঘরও হোলো আকাশও রইল। আজ সম্পর্কের শেষ কথাটা কবিতা হয়ে বেড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণেন্দুর কন্ঠে

তুই আর আমি একসাথে হেঁটেছি অনেকটা সময়

এক-পা দু-পা তিন-পা করে সাত-পা আরও কত

একসাথে সাত পা হাঁটলে, সম্পর্ক নাকি চিরস্থায়ী হয় !

দুজনে একসাথে আমরা কতো পা হাঁটলাম বল তো?

হেঁটেছি কতদিন? কতো-মাস? কতকাল? এর মাঝে –

কতবার অবস্থান বদলালো দূর আকাশের নক্ষত্রেরা,

কতো বর্ষা গেলো, কতো শীত জমলো শরীরের ভাঁজে

কতো দাঙ্গায় মারা গেলো, কতো এলো নতুন মানুষেরা।

আজ হাঁটতে গেলে পাশ ফিরে দেখলেই যায় বোঝা

পায়ে-পা, হাতে-হাত থাকবে? না কি হারিয়ে খোঁজা?

রাজু let’s go –

রাজু আর ইন্দ্রানী নীচে নামতে লাগলো । আগে রাজু তার পরে পরে ইন্দ্রানী ।

ইন্দ্রানী বলল – হাতটা ধরো রাজু, যা অবস্থা পড়ে না যাই ।

খুব ইতস্তত করে রাজু হাত ধরে ম্যাডামকে নীচে নামতে সাহায্য করছে । তুলোর মতো নরম হাত, মনে হয় পিছলে না যায়। রাজুর হাত কাঁপে ঘেমে ওঠে। এই সুন্দর ম্যাডামের মত যদি তার এক বউ থাকতো, হাত ধরে নামিয়ে আনতো ঝর্ণা দেখাতে। দামি মোবাইল কিনে সেলফি তুলে ফেসবুকে দেখাতো সবাইকে। নিচে নেমে দেখলো অনেকেই এসে গেছে ।

ইন্দ্রানী বলল – অসাধারণ লাগছে তো !! কৃষ্ণেন্দুটা কি যে করে না, ওপরেই থেকে গেল ।

আরো অনেক জায়গা দেখে তারা ফিরে এল। আবার সেই হোটেল। ব্যালকনি। পাশাপাশি দুজন। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ থাকার পর ইন্দ্রানী মুখ খুলল – কৃষ্ণেন্দু একটা কথা বলি ?

বল ।

তুই জেলাস ফিল করছিস না ?

কেন ?

এই, আমি যে দুজনের সঙ্গে বেশি close হচ্ছি ।

সেটা তোর ইচ্ছে। আমি কি বলব। মেয়েরা সব পারে। এই আমার সঙ্গে এই অন্য করোর সঙ্গে।

পাশ থেকে সজোরে ধাক্কা মারে ইন্দ্রানী – mind your language, মেয়েরা মানে সব মেয়েই সমান ? কেন তুই জেলাস ফিল করছিস না ? আমিতো ইচ্ছে করে করছিলাম, তোকে দেখানোর জন্য। দেখতে চাইছিলাম আমার প্রতি তোর সেই টানটা আছে কিনা। শোন, তোদের রবি ঠাকুরও জেলাসি দেখিয়েছেন, তবে খুব stylishly । তুই কি ভাবলি আমার শেষের কবিতা পড়া নেই ? পড়ে ফেললাম রবি ঠাকুরের “শেষের কবিতা” ।

কৃষ্ণেন্দু অবাক – কখন ?

রাত জেগে। একটা জিনিস খেয়াল করেছিস কৃষ্ণেন্দু ? বেড়াতে এসে আমরা physically close হই নি । গালে গাল, ঠোঁটে ঠোঁট, শরীরে শরীর কিচ্ছুটি না, কেন বলতে পারিস ? আমরা কি একে অপরকে ঘেন্না করছি কৃষ্ণেন্দু ?

তোর গলায় হাহাকার ইন্দ্রানী ! আমিও তো খুঁজছি রে । আবার দুজনে চুপ থাকার অনেকক্ষণ পরে, –

ইন্দ্রানী বলল – কাল আমি চলে যাচ্ছি ।

কৃষ্ণেন্দু বলল – আরো কটাদিন আমাদের বুকিং আছে ।

তুই থাক, আমি চলে যাব । তোদের রবি ঠাকুরও তো বিচ্ছেদ চাইলেন । বললেন মহান এই সরে যাওয়া। কিন্তু আমি বুঝলাম না লাবণ্য বিয়ে করবে মোহনলালকে আর ভালোবেসে যাবে অমিতকে, অমিত বিয়ে করবে কিটিকে মানে কেতকীকে সারাজীবন লাবণ্য লাবণ্য করে হেদিয়ে মরবে ? তুই জিজ্ঞেস করেছিলি না আমি এই relation টা কে টানতে

চাই কিনা – না – লাভ নেই । আমি নিজেকে নিয়ে ভাবলাম, ছেলেদের সঙ্গে বেশি করে মিশে দেখলাম । নতুন ছেলেদের ভালো লাগছে । আমার মন নতুন relation চাইছে । কাল আমি অন্য গাড়ি নিয়ে নেব । রাজুর সঙ্গে তুই চলে যাস ।

ইন্দ্রানী প্লীজ যাস না । এত সহজে আমাদের গভীর সম্পর্কটা শেষ করিস না ।

সম্পর্কটা আর গভীর নেই কৃষ্ণেন্দু । শুকিয়ে গেছে পুরোনো হয়ে গেছে ।

আমি বিশ্বাস করি না ।

আমি করি । তুই বলতো কৃষ্ণেন্দু, এই কদিনে আমাকে আদর করতে এসেছিস ? জোর করে হলেও তো আসতে পারতিস । কেন এলি না ? তোর ভেতরে লাভা ও শেষ হয়ে গেছে । তাই না ? বল ? তাই তো ?

আজ ইন্দ্রানীর বার বার মনে পড়ছে জয়ন্তর কথা। যে তার চুড়ির ঠনঠন আর নুপূরের নিক্কনের শব্দে আসতে চেয়েছিল যৌবনের প্রথম বেলায়। যার কিনা একজনের কথা বলতে গিয়ে গলা ভার হয়ে এসেছিল। হায় রে ভবিতব্য একদিন চুড়ির হাতের ধাক্কায় যাকে ঘর থেকে পথের মধ্যে ছিটকে পড়তে হয়েছিল, কেন জানিনা মনে হচ্ছে সেই অব্যক্ত কথাটা শোনার জন্যেই সে পথেই চলতে চলতে পা মেলাতে হবে।

কৃষ্ণেন্দু উঠে পায়চারি করে, সে ছটপট করে, হাতে হাত ঘসে – এত সহজে কোনো conclusion এ আসা যায় না ইন্দ্রানী। দুদিন কাছে না এলেই সব কিছু ফুরিয়ে যায় না। সব কিছুতেই ভালো খারাপ সময় থাকবেই, তা বলে ... তুই তুই খারাপটাকেই নিয়ে decision নিয়ে নিবি ?

শোন কৃষ্ণেন্দু আমি খুব strait forward মেয়ে। তাই মিথ্যে না বলে সোজাসুজি যা বলার বলে দিলাম। আমরা অনেকটা সময় আনন্দে কাটিয়েছি মানছি। এখন, এই equation ভেঙ্গে গিয়ে নতুন equation হোক না । রবি ঠাকুরও তো সম্পর্ক ভেঙ্গে নতুন ভাবে গড়লেন। কৃষ্ণেন্দু বলল দেখ ইন্দ্রানী তাই বলে এই ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। তোর রবিঠাকুর কি বলবে জানি না তবে আমার ভাষায় –

তোর দীর্ঘ অনুপস্থিতি বেঁচে থাকা শেখাবে আমাকে

তোর চলে যাওয়া চোখে জল নিয়ে হাসি দেবে মুখে

হাত বাড়িয়ে ছুঁতে না পারার বেদনা শীতল করবে আমায়

আমাকে দেখাবে, শেখাবে এভাবেও বেঁচে থাকা যায়।

না পাওয়ার অসহ্য যন্ত্রণায় তোর বুকে কাঁদতে না পেরে

তোর কাছেই শিখেছি কান্না গিলে ফেলতে হয় কি করে

জীবনের প্রতিটি আঘাত আমাকে দৃঢ় করবে সংযমে

আমাকে দেখাবে, বুঝাবে, জীবন কাটবে জীবনের নিয়মে।

শিলং শহরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ইন্দ্রানীর ভাড়া গাড়ি প্রায় নিশব্দে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ছুটতে থাকে । সূর্যের সোনালি আলো গাছেদের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করতে থাকে । ইন্দ্রানী জানালা দিয়ে মুখ বের করে নতুন সূর্যের আলোর সঙ্গে খেলা করে। প্রতি পলে আলো আসে আবার ছায়া আসে ... ছায়া আসে আবার আলো আসে । পেছনে পড়ে থাকে – শিলং, সম্পর্কের কত ভাঙা টুকরো, পড়ে থাকে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টার কত কোলাজ, সিনেমার ফ্রীজ শটে

জমে যাওয়া কত মুহূর্ত। ইন্দ্রানীর দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামে ... অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের সুরে, লাবণ্যর মত করে ইন্দ্রানীও কৃষ্ণেন্দুর জন্য কবিতা লিখে ফেলল, অনেকটাই রবিঠাকুরকে অনুসরণ করে, ...

কখনো কাজের অবকাশে, কখনো পলাশের মাসে
অতীতের স্মৃতিগুলো যদি ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাসে।
সেইখানে খুঁজে দেখিস, নিশ্চয়ই পাবি তুই আমায়
নতুনের ডাকে, ছুটে যাই হেসে, কৃষ্ণেন্দু, বিদায়।
দুঃখ করিস না, ভেসে চল পরিবর্তনের স্রোতে,
বাকী আছে অনেক কাজ, এ মায়া সংসারের ব্রতে।
যা চেয়েছি দু-হাত ভরে ঈশ্বর দিয়েছেন আমায় –
তোর জীবনের ছন্দ ছেড়ে, বহুদূরে, কৃষ্ণেন্দু, বিদায়।

Indrajit Sengupta – Working in Larsen & Toubro as a Sr. Manager (EHS- Environment, Health & Safety). Already published 2nos. of Kabya Grantha “Nepathyacharini” & “Ogo Bideshini”. “Nepathyacharini” consist of so many poems with the relationship of Togore, Like Anna Tarkhar, Kadambari Devi, Luci, Victoria, Indira, Tomi, Ranu, Hemantabala, Maitreyi etc. “Ogo Bideshini” Consist of so many poems with the relationship of Tagore like Olga Lorenza, Clara Butt, Butension, Harriet Monro, Helen Kellar, Nivedita, Harriet Moody, Miss Jen, Sinclair, etc.

মৌসুমী রায়

পর্ব ২

বেনারসের ডায়রি

(৭)

ঘুম থেকে উঠে কাঁচের জানলার পর্দা সরাতেই দেখি বেশ রোদ ঝলমলে সকাল। রাতের ঘুমটা বেশ জব্বর হয়েছে। ট্রেন জার্নি আর কালকের ঘোরাঘুরির ধকল সামলে আজ বেশ ঝরঝরে লাগছে। ইলেকট্রিক কেটলিতে চায়ের জল গরম করতে বসিয়েছি, দেখি দরজায় টোকা। খুলে দেখি কাপ-প্লেট, টি-ব্যাগ আর দুধ চিনির পাউচ হাতে রিয়াঙ্কা দাঁড়িয়ে। কীর্তির ঘুম ভাঙাতে ব্যর্থ হয়ে আমাদের সাথে চা খেতে আর আড্ডা দিতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির। হোটেলে চার তলায় আমাদের মুখোমুখি ঘর। ভোরে চায়ের কাপে জমাটি আড্ডার আসর। খানিক পরে কীর্তি এসেও যোগ দিলো সে আড্ডায়। ঠিক হলো আজই আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে দেখে আসা হবে। ইতিমধ্যে আমরা মেয়েরা কেনাকাটার একটা লিস্টিও বানিয়ে ফেললাম চা খেতে খেতে। মেয়েদের তিন মাথা এক হলে যা হয় আর কি !!

হোটেলের গেট দিয়ে ঢুকে কয়েক ধাপ নেমে ডানদিকে রিসেপশন। ওই একই ফ্লোরে সোজা গেলে রেস্টুরেন্ট। সুন্দর সাজানো। রেডি হয়ে নীচে নামতে একটু দেরিই হয়ে গেলো। রিসেপশনে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলে আমরা গেলাম ব্রেকফাস্ট সারতে। বুফেতে নানারকম খাবার সাজানো। একটি বিদেশী জুটি টোস্ট কর্নফ্লেক্স ছেড়ে বেশ খুশি খুশি আলুর পরটা খাচ্ছে। ভারতীয় খাবারের বেশ জুতসই একটা বিজ্ঞাপন হতেই পারে। আমরাও খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোতে প্রায় এগারোটা বাজিয়ে ফেললাম। হোটেল থেকে বেরোতেই বেলা বাড়ার উত্তাপ বেশ ভালোই টের পাচ্ছি।

(৮)

বড়ো রাস্তায় গিয়ে দেখি একটা সাদা বোলেরো নিয়ে এক মাঝ বয়সী বেনারসী পাইলট আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। কথা হলো আগে বিড়লা মন্দির ঘুরে সংকটমোচন মন্দিরে যাওয়া হবে। দুপুর বারোটায় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা কিন্তু অলরেডি বেশ লেট করে ফেলেছি। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভেতর অবস্থিত এই বিড়লা

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিড়লা মন্দির

মন্দিরটিতেও বাবা বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান। অনেকটা জায়গা নিয়ে ক্যাম্পাসটি গঠিত। বড়ো বড়ো গাছে মোড়া শান্ত পরিবেশ। সারি সারি সাইকেল স্কুটার স্ট্যান্ড করা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না ভেতরে ক্লাস চলছে। ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের থেকে প্রায় দু কিমি গিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ। এই মন্দির চূড়াটি বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। যে কারণে এটি পৃথিবী বিখ্যাতও বটে। সম্পূর্ণ মার্বেল দিয়ে তৈরি প্রশস্ত দ্বিতল এই বিড়লা মন্দিরটি বিশ্বনাথ মন্দির নামেও পরিচিত। এছাড়াও আরও কিছু বিশিষ্ট দেব দেবীর পুণ্যপীঠ এর সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে। এক তলাটিতে শিবের অধিষ্ঠান। বেশ ঠেলাঠেলি করে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন পাওয়া গেলো। মন্দির গাত্রে সচিত্র গীতার উপাখ্যান। সময়াভাবে সেভাবে আর দেখে ওঠা হলো না। বাইরে এক অসম্ভব অবস্থা। বরুণ দেব আজ এখানে স্বমহিমায়। গেটের বাইরে লস্যির দোকানে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। আমরাও বাদ গেলাম না। এক ভাঁড় করে ঠান্ডা মালাই লস্যি গলাধকরণ করে গাড়িতে উঠে বসলাম। পরের দ্রষ্টব্য সংকটমোচন মন্দির।

(৯)

ঘড়ির কাঁটা আর মিনিট দশেক বাকি ১২টা ছুঁতে। গাড়ি থেকে নেমে সামনেই মন্দিরের গেট। ঢোকার মুখে বড় বড় করে লেখা “জয় শ্রীরাম”। মন্দির দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে আন্দাজ করে সুনীল আর জুতো খোলার ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে বাইরেই থেকে গেলো। গাড়িতে ওর কাছে জুতো ফোন সব রেখে আমরা চার মূর্তি ভেতরে ঢুকলাম। পুণ্যার্থীর ভিড়ে পা রাখা দায়। দেশের সব প্রান্তের মানুষের সমাগম এখানে। বেশ কিছু নব দম্পতিকে নিয়ে তাদের পরিবার এসেছে পুজো দিতে। দরজা বন্ধের আগে দূর থেকেই হনুমানজীকে দর্শন করলাম প্রায় তাঁরই কায়দায় বেশ কিছুটা লম্ফঝম্প করে। যদিও পুজো দেওয়া আর হলো না। সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি তুলসীদাস অসি নদীর তীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে পর পর লাড্ডুর দোকান। “বেসন কি লাড্ডু” এখানকার প্রধান প্রসাদ। ঘিয়ের গন্ধে ম ম করছে চারিধার। লাড্ডু কেনার লম্বা লাইন। তাই এদিক ওদিক না তাকিয়ে মনকে বুঝিয়ে বাইরে চলে এলাম। সময়ের বাধ্যবাধকতা। লাঞ্চ সেরে চারটের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে সারনাথেও ঢুকতে পারা যাবে না। এখনও অনেকটা পথ। ঘি এর গন্ধে খিদেটা বেশ ভালোই টের পাচ্ছি। শহরের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে। মাঝে মাঝেই গেরুয়া বসনধারী ভক্তের দল চোখে পড়ছে। দুর্গা আর ভারত মাতার মন্দির পার করে আমাদের গাড়ি চলেছে সারনাথের দিকে। সারনাথের থাই টেম্পল এর কাছে একটি রেস্টুরেন্টের সামনে এসে গাড়ি থামলো।

এখন লাঞ্চ ব্রেক....

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

পারিজাত ব্যানার্জী

বিতর্ক আড্ডা

বিষয় – জীবনমুখী কবিতা নিয়ে বিতর্ক আড্ডা

স্থান – আনন্দধারা লাইব্রেরী, সিডনি

তারিখ – ২৩/১১/২০১৯

সৌজন্যে – শ্রীমন্ত মুখার্জী, গার্গী মুখার্জী

উৎসাহিদের দল – সঞ্জয় চক্রবর্তী, উর্মি মুখার্জী চক্রবর্তী, তপনজ্যোতি মিত্র, পান্থ, সেঁওতি এবং আমরা বাদবাকি পড়ে থাকি যে কজন।

তার্কিক হিসেবে কোনদিনই নাম কোড়াইনি আমি। লেখালেখির চর্চাটুকু রয়েছে বলেই হয়তো অনেককিছু ভীষণ রকম ভাবায় আমাকে। সৃষ্টি হয় কিছু বক্তব্যের। আর তাই জীবনমুখী কবিতা নিয়ে আনন্দধারা লাইব্রেরীতে হওয়া শনিবারের জমায়েত আমার কাছে প্রধানত ছিল ভাবনা আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্থল। প্রশ্ন এসেছিল আগেই – **"জীবনমুখী ঠিক কেমন ভাগ সাহিত্যের দুনিয়ায় ?"** জীবনকে জড়িয়েই তো আমাদের সমস্ত রচনা, তাই জীবনমুখী তকমাকে আধুনিক সময়ের

সাথেই বা কেন বেঁধে দেওয়া হবে শুধু। দেখলাম আমার এই ভাবনা খুব একটা একপেশে নয়। তপনজ্যোতিদা, দেবুদা, উর্মিদি, রেজাভাই, শ্রেয়সী থেকে মিষ্টিদি, সেঁওতি . . . অনেকেই এই বিষয় ছিলেন একমত। তর্ক জমে উঠতেই বুঝলাম, সমস্যাটা ঠিক 'জীবনমুখী' কে নিয়ে নয়, এই তর্জমার ঠিকঠাক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। সেখানে দেবস্মিতা বললেন, জীবনভিত্তিক কবিতার সঙ্গে তিনি সামান্য হলেও মিল খুঁজে পান ঠিকই, তবে আরও এক বক্তা অসীম দাসের সাথে তিনি একমত, যে কবিতা কখনও নতুন কোনো আন্দোলনের সৃষ্টি করে না। তবে 'বন্দে মাতরম' কি ? 'কারার ওই লৌহকপাট' কেন লেখা এবং তাদের ঐতিহাসিক মূল্যই বা কেন আজও এত বেশি ? কেন 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি শুনলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে . . . শ্রেয়সীর বা বাসবদার এই প্রশ্নের জোরালো আবেদন কিন্তু ভাবালো সকলকে।

আরেক দলের বুঝলাম আপত্তিটা অন্য জায়গায়। জীবনমুখী বলে কোনো তকমার তাঁরা ঘোর বিরোধী। এইরকম বাজারী এবং বাহারি নাম তাঁদের মনে হয়েছে শুধুই পুরোনো মদকে নতুন বোতলে ভরে বিক্রির পন্থা। সুমিতাভ, রবিরশ্মিদা, সঞ্জয়দা বা সৌমিক দা দের মতো অনেকেই মনে করেন কবিতা কবির একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। তাকে কোনো এরকম বৃহৎ এবং বিমূর্ত গণ্ডি কেটে এভাবে ভাগ করা যায় না।

আবার আরেক দল প্রশ্ন তুললেন এই বিমূর্ততা নিয়েই। লালিদি জিজ্ঞেস করলেন 'এখান থেকে মারলাম ছুরি, লাগলো কলাগাছে, হুলুত করে রক্ত বেরোল, চোখ গেল রে বাবা' এ হেন আপাত দৃষ্টিতে মানে হীন কবিতাগুলি – কিভাবে আধুনিক জীবনমুখী তর্জমা পেতে পারে ? চারটে শব্দ পাশাপাশি বললেই কি কবিতা হতে পারে, নাকি তার সাহিত্যের আঙিনায় আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে ? দেখলাম এই প্রশ্নটি শ্রীমন্তদা, রূপাদি বা সৌমিক বসু দাদাদের মতো অনেককেই বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

উত্তরটা দেবুদা বা তপনজ্যোতি দার সাথে সাথে আমার মনেও হঠাৎ করেই ভেসে উঠল যেন। মনে পড়ল এক প্রবল মানসিক ধাক্কা পাওয়ার পর কিভাবে আমার কবিতা বা আমার প্রথম প্রকাশিত বই 'লাল স্নানের গন্ধ' এর প্রায় সবকটি ছোটগল্পে এনে দিয়েছিল এক অন্ধকার Abstract ভাব, যা কেবল আমার কাছেই হয়তো বয়ে আনত মানে। প্রতিটা কবি বা লেখকই ঠিক কেন লেখেন। সবসময় যে তা পাঠককে নতুন করে কিছু ভাবাতে চায় তা কিন্তু নয়। লেখকের কলম বহু ক্ষেত্রেই হয়তো উত্তর খোঁজেন তাঁর গহিনে লালিত বহু অভাবনীয় প্রশ্নের। তাই জন্ম নেয় রূপকেরা – ভাবনারা ছাড়িয়ে যায় সকল বাঁধনের উপত্যকা। তাই আমার তখনকার এক লেখা

"ছেলেটি একলা, কানে শোনে না কিছু,

ছেলেটা বোকা, জলে ঢিল ছোড়ে শুধু !"

পাঠকের কাছে তার মানে না পৌঁছে দিতে পারলেও আসলে রয়ে যায় অন্য কোনো দিগন্তের – "**জীবনমুখী**" কবিতাই!

কাগজের নৌকাখানি ভাসিয়ে দিলেম নদীর জলে..
দেশ থেকে দেশান্তরে নদী যেন বয়েই চলে..

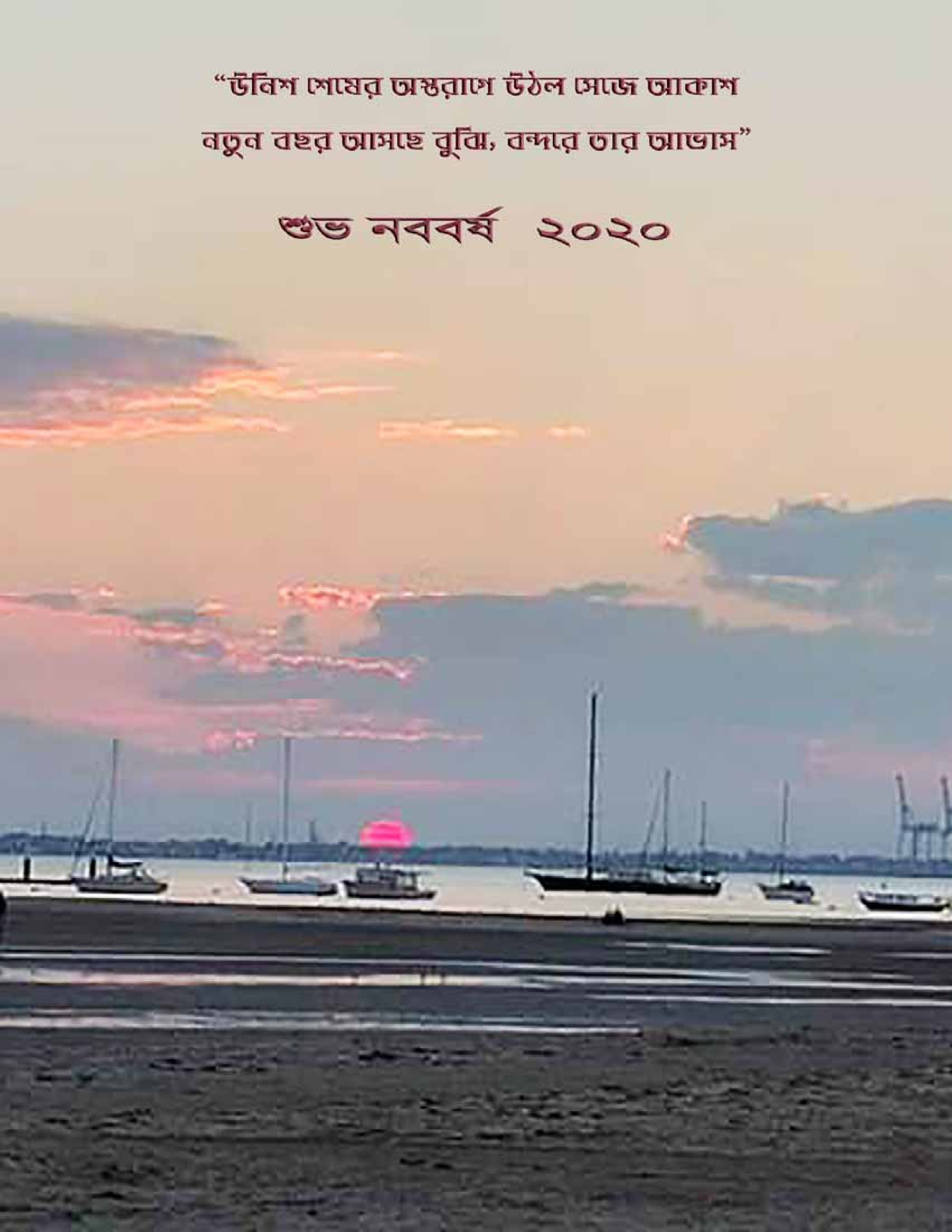
“উনিশ শেষের অস্তরাগে উঠল সেজে আকাশ
নতুন বছর আসছে বুঝি, বন্দরে তার আভাস”
শুভ নববর্ষ ২০২০